বিজ্ঞান

অনুশীলন বই

দাখিল অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিজয় উল্লাস : ১৯৭১

১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) জনগণ সর্বপ্রকার অত্যাচার, শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন এবং ২৬শে মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয় নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান, শিশু-কিশোরসহ সর্বস্তরের জনগণ। পাকিস্তানি সেনাদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার ২ লাখের অধিক মা-বোনের ত্যাগ এবং ৩০ লক্ষ বাঙালির প্রাণের বিনিময়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করে বাংলাদেশ। বিশ্ব ইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের প্রথম দেশ, যে দেশ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

বিজ্ঞান | অনুশীলন বই

দাখিল
অষ্টম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল
ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান খান
রনি বসাক
ড. তাহমিনা ইসলাম
মোঃ ইশহাদ সাদেক
সাইফা সুলতানা
নাসরীন সুলতানা মিতু
শিহাব শাহরিয়ার নির্ঝর
মোঃ রোকনুজ্জামান শিকদার
ড. মানস কান্তি বিশ্বাস
মোঃ মাহমুদ হোসেন
ড. মোঃ ইকবাল হোসেন

সম্পাদনা

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্পনির্দেশনা
মঞ্জুর আহমদ
নাসরীন সুলতানা মিতু

চিত্রণ
সব্যসাচী চাকমা

প্রচ্ছদ
মেহেদী হক
সব্যসাচী চাকমা

গ্রাফিক্স ডিজাইন
নাসরীন সুলতানা মিতু

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা .... i - v

যাযাবর পাখিদের সন্ধানে ০১

সূর্যঘড়ি ২০

সবুজ বন্ধু ৪০

ফিল্ড ট্রিপ ৫৬

আমাদের ল্যাবরেটরি ৭৩

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

জীবজগতের বংশলতিকা ৯১

বাজনার উৎসব ১০৫

পরিবেশ সুরক্ষা ১১৬

শরীর নামের অবিশ্বাস্য যন্ত্র ১৩৩

খাদ্যে ভেজাল! ১৪৯

শিক্ষার্থীর প্রতি,

প্রিয় শিক্ষার্থী, বিজ্ঞান পড়তে তোমাদের কেমন লাগে? পড়তে যত না ভালো লাগে, হাতে কলমে বিজ্ঞানের কাজ করতে নিশ্চয়ই তার চেয়ে অনেক বেশি ভালো লাগে! তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, এখন বিজ্ঞান শিক্ষা শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষে আর পাঠ্যবইতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সত্যিকারের বিজ্ঞানীরা যেরকম গবেষণা করেন, সেরকম সত্যিকারের কিছু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই এখন তোমরা বিজ্ঞান শিখবে। আর 'বিজ্ঞান শেখা' বলতে শুধু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মুখস্থ করা নয়, বরং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সত্যিকারের সমস্যা সমাধান করতে শেখা এখন তোমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। অষ্টম শ্রেণির পুরো বছর জুড়েই তোমাদের জন্য কিছু গবেষণাধর্মী কাজ দেওয়া হয়েছে। আর তোমাদের এই গবেষণার কাজগুলোয় সাহায্য করার জন্য দিক-নির্দেশক বা রেফারেন্স (Reference) বই হিসেবে বিজ্ঞান বিষয়ের আরেকটি বই দেওয়া আছে, 'অনুসন্ধানী পাঠ'; পেয়েছ নিশ্চয়ই! বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতায় যখনই দরকার পড়বে তোমরা এই বইটির সাহায্য নিতে পারবে। আর শিক্ষক তো রয়েছেনই তোমাদের সাহায্য করার জন্য।

এই বইটি তোমার!!

এই বইটি শুধুই তোমার; বিজ্ঞানের নানা খুঁটিনাটি, হুট করে মাথায় আসা চিন্তা, নিজের যত ভাবনা টুকে রাখার জায়গা। সারা বছরের বিজ্ঞান বিষয়ে যা যা কাজ করবে, পুরো সময় জুড়ে এই বইটি বন্ধুর মতোই তোমাকে সাহায্য করবে!

বইয়ের শুরুতেই তাই পরিচিতি পর্বটাও সেরে নেওয়া যাক, কী বলো? প্রথমেই তোমার নাম আর আইডি লিখে ফেলো নিচের ফাঁকা জায়গায়:

....

....

বইটার সাথে তোমার পরিচয়টা আরেকটু পোক্ত করতে তোমার নিজের সম্পর্কে আরেকটু জানা গেলে ভালো হয়, তাই না?

তোমার নিজের সম্পর্কে যা যা বলতে ইচ্ছে করে, তেমন কিছু কথা কয়েক লাইনে লিখে রাখো এখানে:

....

....

....

....

....

....

ভূমিকা

আমাদের চারপাশে অজস্র ঘটনা সবসময়ে ঘটতে থাকে। তোমাদের মনে নিশ্চয়ই অনেক প্রশ্ন আসে, এগুলো কেন ঘটে, কীভাবে ঘটে। কেউ কেউ হয়ত নিজে নিজে সেগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টাও করেছ অনেক সময়ে।

এইবার আমরা সবাই মিলে এমন অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর খুঁজব। সেই কাজটা একটু গুছিয়ে করতেই তোমাদের এই অনুশীলন বই। কীভাবে ধাপে ধাপে বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে তা এখানে বিস্তারিত দেওয়া আছে। এই কাজগুলো করতে গিয়ে তোমাদের বিজ্ঞানের নানা তথ্য ও তত্ত্ব জানার প্রয়োজন হতে পারে, তোমাদের মনে জাগতে পারে নতুন নতুন প্রশ্ন। এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে সাহায্য করবে তোমাদের বিজ্ঞানের 'অনুসন্ধানী পাঠ' বইটি। এছাড়াও, সারা বছরের শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ অর্জনের বিভিন্ন ধাপে এই দুইটি বই তোমাদের সরাসরি সাহায্য করবে।

অষ্টম শ্রেণির শিখন অভিজ্ঞতার শিরোনামগুলো ডানে দেওয়া হলো। একনজর দেখে নাও-

১ যাযাবর পাখিদের সন্ধানে

২ সূর্যঘড়ি

৩ সবুজ বন্ধু

৪ ফিল্ড ট্রিপ

৫ আমাদের ল্যাবরেটরি

৬ জীবজগতের বংশলতিকা

৭ বাজনার উৎসব

৮ পরিবেশ সুরক্ষা

৯ শরীর নামের অবিশ্বাস্য যন্ত্র

১০ খাদ্যে ভেজাল!

শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর ধরন কেমন হবে?

শিখন অভিজ্ঞতার শিরোনাম	আমরা যা করব
যাযাবর পাখিদের সন্ধানে	ভূ-পর্যটক বললে হয়তো চট করে বিখ্যাত কজন পরিব্রাজকের কথাই আমাদের মাথায় আসে। কিন্তু মানুষ ছাড়াও অন্য প্রাণীদের মধ্যেও কি পর্যটক দেখা যায়? পরিযায়ী পাখিদের কথা নিশ্চয়ই তোমরা সকলেই জানো, যারা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বিশাল দূরত্ব পাড়ি দিয়ে অন্য দেশে গিয়ে ঘর বাঁধে। এই শিখন অভিজ্ঞতায় এই যাযাবর প্রাণীদের সম্পর্কে আরেকটু জেনে নেয়া যাক, চলো!
সূর্যঘড়ি	মানুষ যখন ঘড়ি আবিষ্কার করেনি তখন সময়ের হিসাব কী করে রাখত বলো তো? সূর্য ও চাঁদের গতিপথ, আকাশের তারা এই তো ছিল সম্বল! এখন তোমরা জানো, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে, সেজন্য আমরা নিয়মিত সূর্যের উদয় আর অস্ত দেখি। এখন পৃথিবীর এই গতিপথ সারা বছর কি একই রকম? সূর্যের অবস্থানের উপর নির্ভর করে যে আলো-ছায়া আমরা দেখি, তা দিয়ে কি সত্যিই নির্ভুলভাবে সময় বোঝা সম্ভব? চলো দেখা যাক!
সবুজ বন্ধু	স্কুলে বা স্কুলের বাইরে তোমাদের তো অনেক বন্ধুবান্ধব। সবাই যে মানুষ, এমনও নয়। অনেকে বিড়াল বা কুকুর পোষে, তারাও আমাদের চারপেয়ে বন্ধু। কেমন হয় যদি কোনো একটা গাছের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হয়? অনেকে হয়তো ভ্রু কুঁচকে ভাবছ, গাছ তো কথাই বলতে পারে না, তার কোনো আবেগ অনুভূতিও নেই, সে আবার বন্ধু হবে কী করে? সত্যিই কি গাছের অনুভূতি নেই? চলো, একটু খুঁটিয়ে দেখি!
ফিল্ড ট্রিপ	ঘুরতে গিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলো সহজ করে হাতেকলমে শিখে নিলে কেমন হয় বলো তো? এই অভিজ্ঞতায় তোমরা নিজেরাই একটা ভ্রমণ পরিকল্পনা করে সেখান থেকে দূরত্ব, সরণ, দ্রুতি, বেগ, ত্বরণ ইত্যাদি রাশিগুলো সম্পর্কে জানবে ও পরিমাপ করতে শিখবে।

শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর ধরন কেমন হবে?

শিখন অভিজ্ঞতার শিরোনাম	আমরা যা করব
আমাদের ল্যাবরেটরি	বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে কত কিছু থাকে দেখেছ? কেমন হতো যদি তোমাদের নিজেদের এরকম একটা গবেষণাগার থাকত যেখানে নানা ধরনের উপকরণ দিয়ে তোমরা সত্যিকারের বিজ্ঞানীদের মতো সব এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারতে? এই অভিজ্ঞতায় তোমাদের ক্লাসরুমকেই কীভাবে একটা গবেষণাগার হিসেবে গড়ে তোলা যায় চলো দেখা যাক! নিশ্চয়ই ভাবছ, ল্যাবরেটরি বানাতে কত কিছু লাগে, এত কিছু পাওয়া যাবে কী করে? সত্যি বলতে, আমাদের বাসাবাড়িতে বা প্রাত্যহিক প্রয়োজনে আমরা যা যা ব্যবহার করি তার মধ্য থেকেই বেছে নেয়া যাবে আমাদের ল্যাবরেটরির দরকারি সব উপকরণ। চলো শুরু করা যাক!
জীবজগতের বংশলতিকা	আমাদের চারপাশে এই যে অজস্র জীব বাস করে, এসব জীব নিয়েই আমাদের জীবজগৎ, পৃথিবীব্যাপী বিশাল এক পরিবার। এই জীবেরা নিজেরা কীভাবে সম্পর্কযুক্ত, এদের মধ্যে মিল-অমিল কেমন—এই বৃহৎ পরিবারে মানুষের অবস্থানই-বা কোথায়? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এই শিখন অভিজ্ঞতা; চলো, তৈরি করা যাক জীবজগতের বংশলতিকা!
বাজনার উৎসব	গুনগুন করে গান গাইতে কার না ভালো লাগে! সুন্দর কোনো দিনে তোমার নিশ্চয়ই গান গাইতে ইচ্ছে করে, 'আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে!' এই অভিজ্ঞতায় গুনগুন করে গাওয়া গান কিংবা খেলার মাঠে গলা ফাটিয়ে চিৎকার থেকে শুরু করে যে কোনো শব্দ কীভাবে তৈরি হয়, কীভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে যায় ইত্যাদি জানার মাধ্যমে পদার্থবিজ্ঞানের 'তরঙ্গ' নামক খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সম্পর্কে জানবে।

শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর ধরন কেমন হবে?

শিখন অভিজ্ঞতার শিরোনাম	আমরা যা করব
পরিবেশ সুরক্ষা	পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টা আমাদের কারো জন্যই নতুন নয়। এর আগে বিভিন্ন শ্রেণিতে পরিবেশ সচেতনতার জন্য তোমরা অনেক কাজ করে এসেছ। কিন্তু তোমার নিজের প্রতিদিনের কার্যক্রমে পরিবেশের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়ে তা কি ভেবে দেখেছ কখনও? এই শিখন অভিজ্ঞতায় প্রত্যেকেই নিজেদের দিকে একটু ফিরে তাকানো যাক, চলো। দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে আমরা অসচেতনভাবে পরিবেশের ক্ষতি করে চলেছি কি না তা খুঁজে দেখা, এবং এর সত্যিকারের সমাধান বের করাই আমাদের এবারের কাজ।
শরীর নামের অবিশ্বাস্য যন্ত্র	একটি যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ যেমন আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন কাজ করার মাধ্যমে একটি সামগ্রিক কাজ সম্পাদন করে তেমনি আমাদের মানব শরীরকেও একটি বড়ো যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মানবশরীরের বিভিন্ন সিস্টেম বা তন্ত্র নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে আমাদের পুরো শরীর নামের সিস্টেমটিকে সচল রাখে, এবং সাম্যাবস্থায় রাখে। আগের শ্রেণিতেও তোমরা মানবশরীরের কয়েকটি তন্ত্র সম্পর্কে জেনেছ, এবার এই শ্রেণিতেও একইভাবে আরও কয়েকটি তন্ত্র কীভাবে নিজেদের মধ্যকার আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম চালু রাখে সেটাই দেখা যাক!
খাদ্যে ভেজাল!	ভেজাল খাদ্য একটি সামাজিক সমস্যা যা দৈনন্দিন জীবনে আমারা সবাই মুখোমুখি হয়েছি। এই সমস্যা গণস্বাস্থ্যের জন্য বেশ ক্ষতিকর। কতিপয় অসাধু মানুষ বেশি লাভের জন্য খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে ভেজাল দিচ্ছে। যার মাধ্যমে মানুষ নানা রকম জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এমনকি মৃত্যুর ঝুঁকি পর্যন্ত সৃষ্টি হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের উপস্থিতি সাধারণ মানুষের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাজারে অনেক ধরনের খাবারে আমরা ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি দেখা যায়, যা শাকসবজি, দুধ, ফলমূল এবং মাছ-মাংসসহ বিভিন্ন খাবারে থাকতে পারে। ভেজাল খাবার মানুষের বিভিন্ন ধরনের রোগের কারণ হতে পারে। এই জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়েই আমাদের এবারের অনুসন্ধান!

যাযাবর পাখিদের সন্ধানে

ভূ-পর্যটক বললে হয়তো চট করে বিখ্যাত কজন পরিব্রাজকের কথাই আমাদের মাথায় আসে। কিন্তু মানুষ ছাড়াও অন্য প্রাণীদের মধ্যেও কি পর্যটক দেখা যায়? পরিযায়ী পাখিদের কথা নিশ্চয়ই তোমরা সকলেই জানো, যারা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বিশাল দূরত্ব পাড়ি দিয়ে অন্য দেশে গিয়ে ঘর বাঁধে। এই শিখন অভিজ্ঞতায় এই যাযাবর প্রাণীদের সম্পর্কে আরেকটু জেনে নেয়া যাক, চলো!

প্রথম ও দ্বিতীয় সেশন

- তোমাদের এলাকায় এমন কোনো পাখি কি দেখেছ যাদের শুধু বছরের নির্দিষ্ট একটা সময়েই দেখা যায়? কখনও ভেবে দেখেছ বছরের বাকি সময়টা এরা কোথায় থাকে?

- অনেকে নিশ্চয়ই ইতোমধ্যেই বুঝে ফেলেছ এখানে কাদের কথা বলা হচ্ছে! হ্যাঁ, পরিযায়ী পাখিদের (যাদের অনেক সময়ে অতিথি পাখিও বলা হয়) কথাই বলছি। তোমাদের এলাকায় কোন কোন পরিযায়ী পাখি এসে বাসা বাঁধে, বছরের কোন সময়ে এদের দেখা যায় তোমরা কি বলতে পারো? তোমার সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করে নিচে লিখে রাখো-

এলাকার নাম (গ্রাম/থানা/উপজেলা, জেলা) :

পরিযায়ী পাখির নাম	বছরের কোন সময়ে দেখা যায়?

- এবার পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া পাখিগুলোর ছবি দেখো, এদের মধ্যে কোনো পাখি কি চিনতে পারো? তোমাদের এলাকায় কখনও দেখেছ? বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করে দেখো তারা কেউ চিনতে পারে কি না।

খয়রা চখাচখি

কালো স্কিমার

দেশী শুমচা

বন বাটান

লালঝুঁটি ভুতিহাঁস

সাদা খঞ্জন

- এবার ক্লাসের সবাই আলোচনা করে দেখো, কেউ কোনো পাখি চিনতে পারল কি না।

- পরিযায়ী পাখি সামনাসামনি দেখার সৌভাগ্য না হলেও নিশ্চয়ই পত্রপত্রিকায় পড়েছ? বছরের কোন সময়ে এরা আসে? কোথা থেকেই-বা আসে? চলো এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে দেখা যাক।

- প্রথমে শিক্ষকের নির্দেশ মোতাবেক দলে ভাগ হয়ে যাও। পৃথিবীর কোন অঞ্চল থেকে পরিযায়ী পাখিরা এদেশে আসে, কিংবা তাদের যাত্রাপথ আসলে কেমন সেটা বোঝার জন্য আগে পৃথিবী-পৃষ্ঠে বিভিন্ন জায়গার অবস্থান কীভাবে নির্দিষ্ট করা হয় তা জানতে হবে। সেজন্য শুরুতে পৃথিবীর একটা মডেল বানানো দরকার।

- তোমাদের স্কুলে গ্লোব আছে নিশ্চয়ই? প্রথম কাজ হলো সেটা দেখে নিজেরা পৃথিবীর একটা মডেল তৈরি করা। যে কোনো বল বা গোলক আকৃতির কিছুর গায়ে সাদা কাগজ মুড়ে মডেল তৈরির কাজটা শুরু করতে পারো।

- এখন এই গ্লোবে বিভিন্ন এলাকা চিহ্নিত করার পালা। কিন্তু কাজটা কীভাবে করা যায়, বলো তো? পৃথিবীর মডেলে মহাদেশগুলো এমনভাবে আঁকা দরকার যেন অতিথি পাখির যাত্রাপথের একটা ধারণা ভালোভাবে পাওয়া যায়। সেজন্য পৃথিবী-পৃষ্ঠে কোনো জায়গার অবস্থান কীভাবে বোঝানো যায় সেটা জানা জরুরি।

- শিক্ষকের দেয়া গ্লোবটা ভালোভাবে লক্ষ করো। গ্লোবের উপর থেকে নিচে লম্বালম্বি এবং দু পাশে আড়াআড়ি বেশ কিছু রেখা টানা হয়েছে খেয়াল করেছ? এই রেখাগুলো কী কাজে লাগে বলতে পারো? তোমার ধারণা নিচে লিখে রাখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

- অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের "ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক, স্থানিক সময় এবং অঞ্চলসমূহ" অধ্যায়ের ভৌগোলিক স্থানাঙ্কের অংশটুকু পড়ে দলে আলোচনা করো।

- এবার অক্ষাংশ কীভাবে বের করা হয় সেই অংশটুকু একই অধ্যায় থেকে পড়ে নাও। অক্ষাংশের মাপ নেবার জন্য তোমাদের বানানো মডেলটা কেটে বোঝার চেষ্টা করলে সেটা আর ব্যবহারযোগ্য থাকবে না। কাজেই কোনো নিরেট গোলকাকৃতির বস্তু নিয়ে এই পর্যবেক্ষণটি করতে পারো, যেমন

পেয়ারা বা কমলা ব্যবহার করা যেতে পারে। পেয়ারার গায়ে দাগ কেটে এটাকে উপর থেকে নিচে মাঝ বরাবর কেটে নিয়ে অক্ষাংশের কোণ মেপে দেখতে পারো। (কাটাকাটির জন্য ছুরি বা ধারালো কিছু ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধান থেকো যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে)।

- পেয়ারার (বা অন্য যে কোনো নিরেট গোলক যেটা পর্যবেক্ষণে ব্যবহার করছ) গায়ে অক্ষাংশ মেপে বিষুবরেখা, কর্কটক্রান্তি রেখা, মকরক্রান্তি রেখা, মেরু রেখা ইত্যাদি এঁকে নাও। তোমাদের বানানো পৃথিবীর মডেলে একইভাবে এই রেখাগুলো আঁকার চেষ্টা করো।

তৃতীয় সেশন

- এই সেশনের শুরুতে আগের দিনের মডেলগুলো দেখে আগের আলাপগুলো একবার ঝালাই করে নাও।

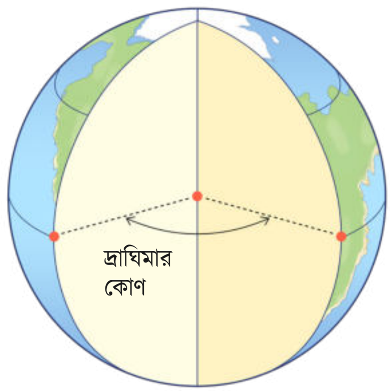

- এবার অক্ষাংশের তাৎপর্য ও ব্যবহার, অক্ষাংশের ভিত্তিতে বিভক্ত বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে পড়ে নাও। বইয়ে দেয়া প্রশ্ন তিনটির উত্তর কী হতে পারে তা নিয়ে দলে সিদ্ধান্ত নাও। শিক্ষকসহ ক্লাসের বাকিদের সঙ্গে তোমাদের উত্তরগুলো আলোচনা করো।
- এবার তোমাদের বানানো মডেলে বিষুবীয় অঞ্চল, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল, মেরু অঞ্চল চিহ্নিত করো।
- একইভাবে দ্রাঘিমাংশ বের করার পদ্ধতি পড়ে নিয়ে নিজেরা আগের মতো কোণ মেপে হিসাব করার চেষ্টা করো।
- অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অবস্থান কীভাবে বের করা হয় তা কি বুঝতে পারছ? এই পদ্ধতিতে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান তোমাদের বইয়ে দেয়া আছে। আরও সূক্ষ্মভাবে মেপে দেখলে তোমার স্কুলের অবস্থানটাও একেবারে নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব। এমনকি এই মুহূর্তে তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো তাও পৃথিবীর মানচিত্রে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশের সূক্ষ্ম হিসেব দিয়ে বলা সম্ভব। তোমাদের শিক্ষকের স্মার্টফোন ডিভাইস থেকে থাকলে তাকে

GPS কী?

GPS এর পুরো নাম Global Positioning System (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম)। একসময় মানচিত্র, কম্পাস, স্কেল ইত্যাদি দিয়ে মেপে ও অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করা হত। এখন GPS প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুব সহজে ও নিখুঁতভাবে পৃথিবীর যেকোন স্থানের অবস্থান জানা যায়। গাড়ি, জাহাজ, প্লেন, ল্যাপটপ এমনকি সাধারণ মডেলের স্মার্টফোনেও এখন GPS রিসিভার থাকে।

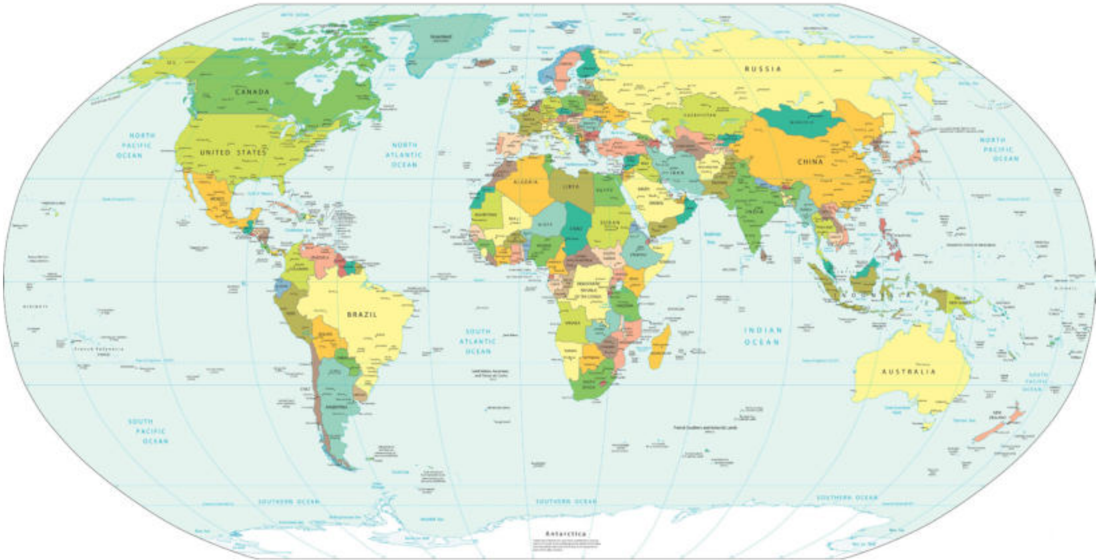

জিজ্ঞেস করে তোমাদের স্কুলের অবস্থানটা নির্দিষ্ট করে জেনে নাও। স্মার্টফোনের জিপিএস ব্যবহার করে যে কোনো স্থানের অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ বের করা যায়।

✎ মানচিত্রের সাহায্য নিয়ে নিচের ছকে দেয়া দেশগুলোর অবস্থান অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ দিয়ে চিহ্নিত করতে পারবে? দলের অন্যদের সাহায্য নাও।

দেশের নাম	মানচিত্রে অবস্থান (অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ)
কম্বোডিয়া	
উরুগুয়ে	
ডেনমার্ক	
মাদাগাস্কার	
জাপান	
সেনেগাল	

✎ এবার একটা ছোট্ট খেলা খেলা যাক। ক্লাসের ভেতরে এক দল অন্য দলকে কোনো একটি দেশের

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ জিজ্ঞেস করবে, অন্য দলের কাজ হবে সেটা পৃথিবীর মানচিত্র দেখে বলা।

একটা বিষয় খেয়াল করেছ? গ্লোবে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের যে আকার দেখি, ছাপানো দ্বিমাত্রিক মানচিত্রে যে আকার দেখি তা হুবহু এক নয়। গোলাকার একটা তলকে যখন দ্বিমাত্রিক তলে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় তখন এই বিপত্তি ঘটে। বিশ্বাস না হলে তোমরা গ্লোবে এন্টার্কটিকা মহাদেশের আকার, আর ছাপানো মানচিত্রে বা যেকোনো দ্বিমাত্রিক মানচিত্রে একই মহাদেশের আকার তুলনা করে দেখো!

চতুর্থ সেশন

এই সেশনের শুরুতে তোমাদের তৈরি পৃথিবীর মডেলে অক্ষরেখা আর দ্রাঘিমারেখার মিলিয়ে নিয়ে গ্লোব বা মানচিত্রের সাহায্যে মহাদেশগুলো এঁকে নাও।

এবার একটা বিষয় ভেবে দেখো। বাংলাদেশে যখন ভরদুপুর, পৃথিবীর উল্টোদিকে তো তখন মধ্যরাত। তাহলে কোন দিকে কখন দিন, শুরু হবে, কটা বাজবে সেটা কীভাবে ঠিক হবে? আবার একেক জায়গায় যেহেতু একেক সময়ে দিন শুরু হচ্ছে, তাহলে কোন এলাকায় কোন তারিখ তা কীভাবে ঠিক করা যাবে?

এই সমস্যার সমাধানের জন্য সকল দেশ একটা নির্দিষ্ট নিয়মে এই দিন-তারিখ নির্ধারণের বিষয়ে একমত হয়েছে। তোমাদের অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা, এবং সময় ও তারিখ নির্ণয়ের উপায় অংশটুকু পড়ে নাও। নিজেরা আলোচনা করো, কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হলে বাকিদের সাহায্য নাও।

ঘড়িতে কটা বাজে একবার দেখে নাও। এবার আগের সেশনে আলোচিত দেশগুলোর অবস্থান আরেকবার দেখে নিয়ে হিসেব করে বের করো, এখন এই দেশগুলোর কোথায় কটা বাজে?

দেশের নাম	এই মুহূর্তে ঘড়িতে সময়
বাংলাদেশ	
কম্বোডিয়া	
উরুগুয়ে	
ডেনমার্ক	
মাদাগাস্কার	
জাপান	
সেনেগাল	

পঞ্চম সেশন

- পৃথিবীর মানচিত্র নিয়ে ভাবতে ভাবতে পরিযায়ী পাখিদের কথা ভুলে যাওনি তো? পরিযায়ী পাখিদের ভ্রমণের পথ সম্পর্কে জানার কয়েকটি উপায় আছে। তারমধ্যে খুবই কার্যকর একটা উপায় হলো এই পাখিদের গায়ে একটা ছোট্ট ডিভাইস সংযুক্ত করে দেয়া যার মাধ্যমে পাখিটি কখন কোথায় আছে তা জানা যায়। আর এই পাখিদের যাত্রা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা চমকপ্রদ সব তথ্য পেয়েছেন।

- পরের পৃষ্ঠায় দেখানো পৃথিবীর মানচিত্রে পরিযায়ী পাখিদের প্রধান যাত্রাপথগুলো দেখানো হয়েছে লক্ষ করো। এই মানচিত্রে বাংলাদেশের উপর দিয়ে, বা কাছ দিয়ে কোন পথগুলো গেছে খেয়াল করেছ? নামগুলো নিচে লিখে রাখো—

....

....

- মানচিত্রে যে কয়েকটি ভ্রমণপথ বা ফ্লাইওয়ে বাংলাদেশের উপর দিয়ে গেছে পৃথিবীর মানচিত্র বা গ্লোব, কিংবা তোমাদের তৈরি পৃথিবীর মডেলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। এক-একটা ফ্লাইওয়ে ধরে কী বিশাল লম্বা পথ এই পাখিরা পাড়ি দেয় ভেবে দেখেছ?

- শুধু East Asian-Australian Flyway দিয়েই এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্যমতে ২৫০ প্রজাতির প্রায়

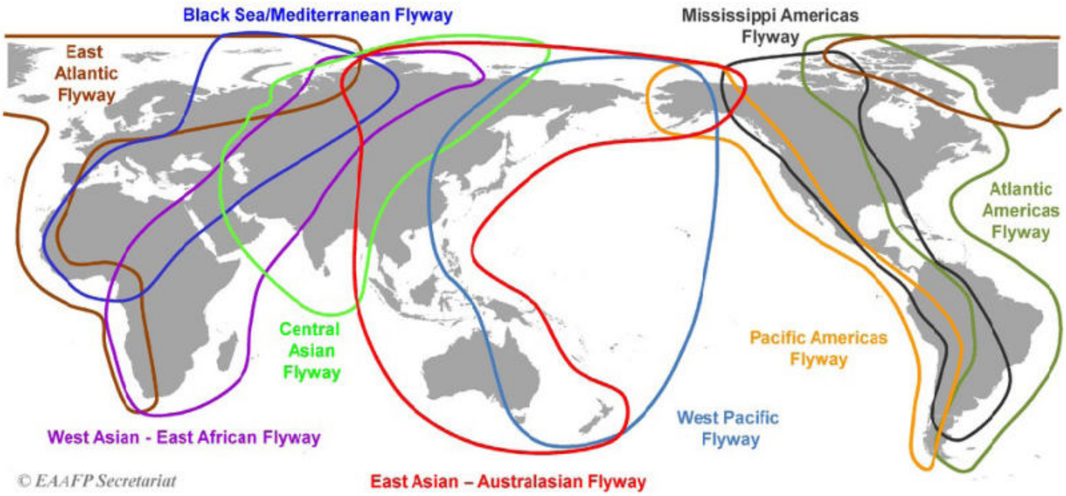

৫ কোটি পাখি চলাচল করে থাকে। এই ফ্লাইওয়ে বাংলাদেশসহ আর কোন কোন দেশের উপর দিয়ে গেছে নিচে লিখে রাখো—

সারা পৃথিবীতে অজস্র পাখি পরিযায়ন করে, তবে তাদের এই পরিযায়নের একটা সাধারণ প্যাটার্ন আছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই পরিযায়ী পাখিরা শরত/হেমন্তের দিকে দক্ষিণের দিকে পরিযায়ন শুরু করে। শীতকালটা তারা প্রায়শই দক্ষিণের কোনো অঞ্চলে কাটায়। বসন্তে তারা আবার উত্তরের দিকে যাত্রা শুরু করে, গ্রীষ্মে উত্তরের অঞ্চলগুলোতেই তারা বাসা বাঁধে ও প্রজনন করে। তবে বাংলাদেশে যেসব পরিযায়ী পাখি আমরা দেখি তারা অনেকেই শুধু শীতকালেই আসে এমন নয়। অনেক পাখি শীতের বেশ কয়েক মাস আগে এসে শীতের

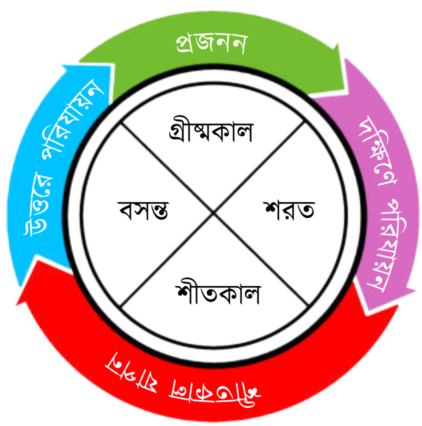

সময়ে আরও দক্ষিণে চলে যায়।

পাখিদের এই পরিযায়নের কারণ কী? সত্যি বলতে তা এখনো নিশ্চিত করে জানা যায়নি, তবে ধারণা করা হয় খাদ্যের প্রাচুর্যের খোঁজে, কিংবা তীব্র শীত থেকে বাঁচতে পাখিরা এই পরিযায়ন করে। পৃথিবীর কোন এলাকার ভূমিরূপ বা জলবায়ু কেমন তা জানলে এই বিষয়ে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।

পরের পৃষ্ঠায় মানচিত্রটি দেখো, এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল চিহ্নিত করা আছে। প্রধান প্রধান ভৌগোলিক অঞ্চলগুলোর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য তোমাদের অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ে দেয়া আছে, সেখান থেকে পড়ে নাও। পরের সেশনে এ নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ষষ্ঠ সেশন

আগের সেশনের মানচিত্রের সঙ্গে পরিযায়ী পাখিদের ভ্রমণপথের চিত্র মিলিয়ে দেখো, এই পাখিরা কোন ধরনের অঞ্চল থেকে কোন ধরনের অঞ্চলে পরিযায়ন করে, বছরের কোন সময়ে এরা কোন ধরনের অঞ্চলে থাকে। বন্ধুদের সঙ্গে বসে আলোচনা করে মিলিয়ে দেখো।

এখন প্রশ্ন হলো, বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভূমিরূপ ও আবহাওয়ার এই পার্থক্যের কারণ কী? দিন-রাত বা ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এর একটা সম্পর্ক আছে বুঝতেই পারছ।

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তোমরা সূর্য ও তাকে ঘিরে পৃথিবীর ঘূর্ণনের একটা মডেল বানিয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পারো, কোন এলাকায় সূর্যের আলো কীভাবে পড়ে। শুরুতে তোমাদের আগেই তৈরি করে রাখা পৃথিবীর মডেলে প্রধান কয়েকটি ভৌগোলিক এলাকা বিভিন্ন রং দিয়ে চিহ্নিত করে নাও, এই এলাকাগুলোর কোনটার অক্ষাংশ কত তাও অনুমান করার চেষ্টা করো। এবার সূর্যের মডেল হিসেবে যে কোনো একটি আলোর উৎস ঠিক করে নাও (মোমবাতি বা এলইডিও ব্যবহার করতে পারো) এবং তার চারপাশে তোমাদের পৃথিবীর মডেলটাকে ঘুরিয়ে দেখো ঘূর্ণন পথের কোন অবস্থানে থাকাকালে পৃথিবীর কোন অঞ্চলে সূর্যের আলো কীভাবে পড়ছে। সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর ঘূর্ণনের পথ এবং এই ঘূর্ণনের ধরন বোঝার জন্য অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের "সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ" অধ্যায়ে সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর ঘূর্ণন অংশের সাহায্য নাও। পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পরের ছকটি পূরণ করো—

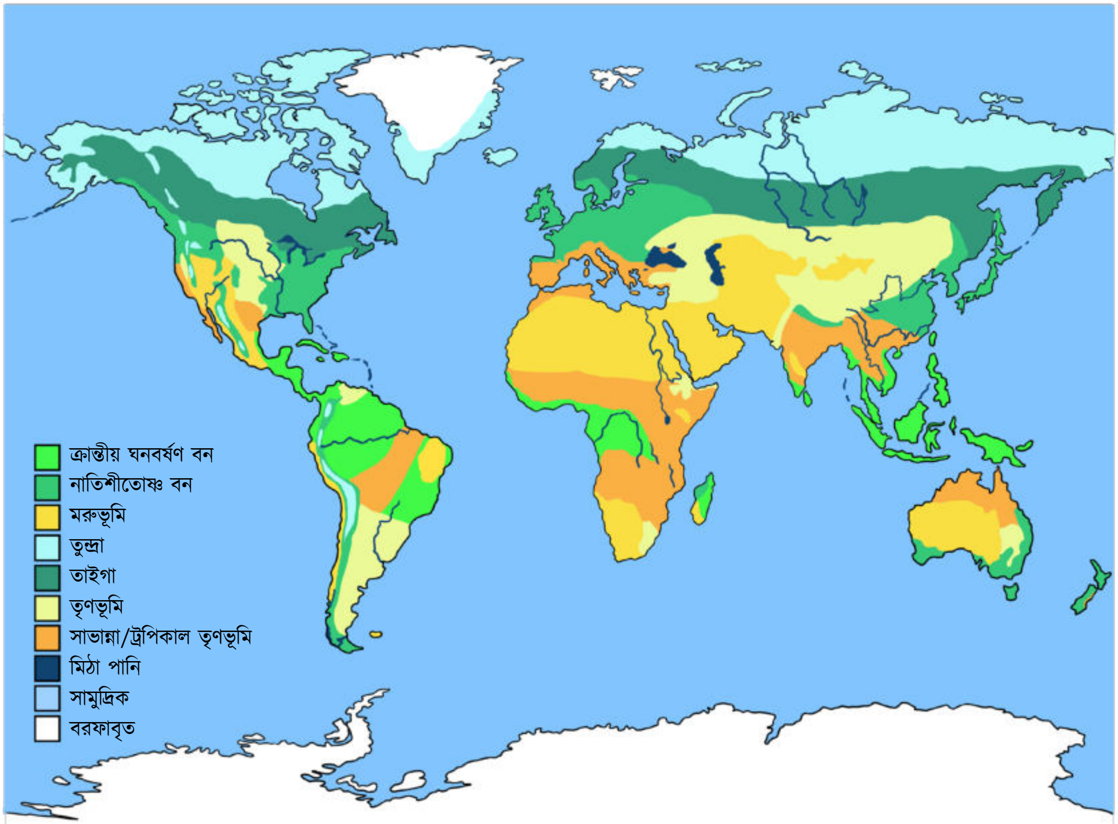

পৃথিবীর বিভিন্ন ধরণের ভৌগোলিক অঞ্চল

বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল	বছরের বিভিন্ন সময়ে সূর্যের আলো আপতিত হবার দিক (খাড়াভাবে/তীর্যকভাবে)				দিনের দৈর্ঘ্য (শুধুই দিন/দিনের দৈর্ঘ্য রাতের চেয়ে বেশি/রাতের দৈর্ঘ্য দিনের চেয়ে বেশি/দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য কাছাকাছি/শুধুই রাত)			
	২১শে মার্চ	২১শে জুন	২৩শে সেপ্টেম্বর	২২শে ডিসেম্বর	২১শে মার্চ	২১শে জুন	২৩শে সেপ্টেম্বর	২২শে ডিসেম্বর
উত্তর মেরু								
তুন্দ্রা অঞ্চল								

বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল	বছরের বিভিন্ন সময়ে সূর্যের আলো আপতিত হবার দিক (খাড়াভাবে/তীর্যকভাবে)				দিনের দৈর্ঘ্য (শুধুই দিন/দিনের দৈর্ঘ্য রাতের চেয়ে বেশি/রাতের দৈর্ঘ্য দিনের চেয়ে বেশি/দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য কাছাকাছি/শুধুই রাত)			
	২১শে মার্চ	২১শে জুন	২৩শে সেপ্টেম্বর	২২শে ডিসেম্বর	২১শে মার্চ	২১শে জুন	২৩শে সেপ্টেম্বর	২২শে ডিসেম্বর
মরুভূমি								
চিরহরিৎ বন								
দক্ষিণ মেরু								

✎ ছকের তথ্যগুলো নিয়ে তোমাদের দলে আলোচনা করো। সূর্যালোকের বিকিরণের প্যাটার্নের সঙ্গে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল সৃষ্টির কোনো সম্পর্ক কি খুঁজে পাও?

✎ আলোচনার পর দলীয় সিদ্ধান্ত ক্লাসের বাকিদের সামনে উপস্থাপন করো। বাকিদের মতামত শোনো।

✎ এবার সবার আলোচনার ভিত্তিতে নিচের প্রশ্নের উত্তর লেখো,

☑ পৃথিবীর ক্রমাগত ঘূর্ণনের পরেও এর বিভিন্ন অঞ্চলে ভৌগোলিক বৈচিত্র্য কীভাবে সংরক্ষিত হয়?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

সপ্তম ও অষ্টম সেশন

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি পরিযায়ী পাখি প্রতি বছর একই পথ ঘুরে কোনো এলাকায় একই জায়গায় এসে ডেরা বাঁধে। আচ্ছা তোমাদের কি মাথায় এসেছে, এই বিশাল রাস্তা চিনে পরিযায়ী পাখি ঠিক জায়গায় কীভাবে পৌঁছায়?

পাখিদের পথ চেনার উপায় বোঝার আগে বরং ভেবে দেখো, আমরা মানুষেরা কীভাবে দিক ঠিক করি? আমাদের দিক চেনার সবচেয়ে বড়ো উপায় হলো সূর্য। এর বাইরেও আমরা দিক নির্ণয় করতে আরেকটা জিনিস ব্যবহার করি, সেটা হচ্ছে কম্পাস। কম্পাস কীভাবে কাজ করে তা তোমরা অনেকেই জানো, কম্পাসের যে দণ্ডটি সব সময় উত্তর দক্ষিণ মুখ করে থাকে সেটি হচ্ছে একটি চুম্বক। বহু বহু বছর আগ থেকে মানুষ দিক নির্ণয়ের জন্য কম্পাস ব্যবহার করে এসেছে। প্রথম কম্পাস ব্যবহারের কথা জানা যায় খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় দুশ বছর আগে, চীন দেশে। পরবর্তী কালে বহু শতাব্দী ধরে সমুদ্রে পাড়ি দেয়া নাবিকেরা জাহাজের দিক ঠিক করার জন্য কম্পাস ব্যবহার করে এসেছে।

পাখি কোন কম্পাস ব্যবহার করে তা জানার আগে চলো জেনে নেয়া যাক, কম্পাসের মূল উপাদান চুম্বক সম্পর্কে।

যে কোনো আকৃতির একটি চুম্বক নাও, এবার বিভিন্ন পদার্থের কাছে নিয়ে দেখো, কোন ধরনের পদার্থকে চুম্বক আকর্ষণ করে, আর কোন ধরনের পদার্থকে করে না। নিচের ছকে নোট নাও।

চুম্বক আকর্ষণ করে		চুম্বক আকর্ষণ করে না	
বস্তুর নাম	কী দিয়ে তৈরি	বস্তুর নাম	কী দিয়ে তৈরি

চুম্বক প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায়, কৃত্রিমভাবেও তৈরি করা যায়। তোমরা কি নিজেরা একটি চুম্বক তৈরি করতে পারবে? চেষ্টা করে দেখা যাক!

- এই পরীক্ষার জন্য লাগবে একটা স্থায়ী চুম্বক, আর একটা ইস্পাতের টুকরা বা সুচ জাতীয় জিনিস। ইস্পাতের টুকরা বা সুচের এক মাথায় স্থায়ী চুম্বকের এক মাথা স্পর্শ করে টেনে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাও। তারপর স্থায়ী চুম্বকটি উপরে তুলে আবার আগের জায়গায় স্পর্শ করে টেনে নিতে হবে, অর্থাৎ ঘর্ষণটি সবসময়ই হতে হবে একমুখী। এভাবে কমপক্ষে বিশবার একই দিকে চুম্বকের একই মাথা ব্যবহার করে ঘর্ষণ চালিয়ে যাও। এবার সুচটিকে কোনো লোহা বা নিকেলের পদার্থের কাছে নিয়ে দেখো, আকর্ষণ করছে কী? তোমাদের পর্যবেক্ষণ নিচে লিখে রাখো।

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

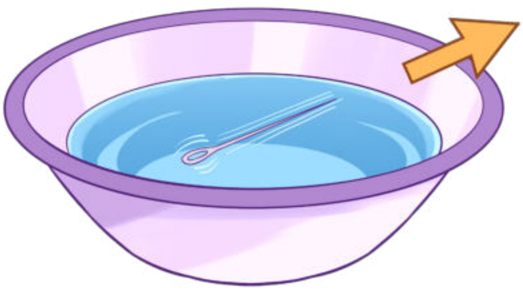

- এখন একটা বাটিতে পানি নিয়ে সেই পানিতে সুচটাকে খুব সাবধানে আলতো করে ভাসিয়ে দাও। পানির পৃষ্ঠটান নামক ধর্মের কারণে তাহলে সুচটি ভেসে থাকবে (উপরের শ্রেণিতে পানির এই ধর্ম সম্পর্কে তোমরা বিশদ জানতে পারবে)। খাড়াভাবে ফেলার চেষ্টা করলে সাথে সাথে সূচটি টুপ করে ডুবে যাবে। সূচকে ভাসিয়ে রাখার আরেকটা বুদ্ধি হলো, একটুকরো ছোট কাগজে সূচটিকে গেঁথে তারপর ভাসিয়ে দেয়া।

- এবার ভালভাবে লক্ষ কর, সুচটি কি উত্তর-দক্ষিণ দিক মুখ করে আছে? নিশ্চিত হতে চাইলে বাটিটাকে একটু ঘুরিয়ে দিয়ে দেখো, সুচের দিক একই থাকছে কি না।

➲ তোমাদের পর্যবেক্ষণ নিচে লিখে রাখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

✎ উপরের পরীক্ষণটি ঠিকঠাক করে থাকলে এতক্ষণে তোমরা কাজ চালানোর মতো একটা কম্পাস তৈরি করে ফেলেছ।

✎ চুম্বক কেন কিছু কিছু পদার্থকে আকর্ষণ করে, আর কেনই-বা উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে থাকে? এই বিষয়গুলো বোঝার জন্য অনুসন্ধানী বই থেকে চুম্বক অধ্যায়ের শুরু থেকে স্থায়ী চুম্বকের অংশটুকু ভালো করে পড়ে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করে নাও।

➲ এখন একটু ভেবে দেখো, চুম্বকের সঙ্গে যেহেতু চার্জের একটা সম্পর্ক আছে, বৈদ্যুতিক প্রবাহের সাহায্যে কি চুম্বক তৈরি করা সম্ভব? চলো চেষ্টা করে দেখা যাক।

➲ একটি ড্রিংকিং স্ট্রয়ের টুকরার উপরে প্লাস্টিক আবৃত বৈদ্যুতিক তার বেশ কয়েকবার পেঁচিয়ে নাও। শুধু এক পাক তারে চৌম্বক ক্ষেত্র বেশি হয় না বলে বেশ কয়েকবার পেঁচিয়ে নিতে হয়। এবারে একটা কম্পাসের কাছে প্যাঁচানো তারটি রাখ, স্বাভাবিকভাবে কম্পাসের কাঁটাটি শুরুতে উত্তর দিকে মুখ করে থাকবে। এবারে কুণ্ডলীর তারের দু মাথায় একটি ব্যাটারির দু মাথা স্পর্শ করে রাখো। কী দেখছ? কম্পাসটি কি কুণ্ডলীর দিকে ঘুরে যাচ্ছে? এবার আবার ব্যাটারিটি ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের দিকে পাল্টে দিয়ে দেখো, কম্পাসের দিকের কোনো পরিবর্তন দেখছ? পরীক্ষায় তোমাদের পর্যবেক্ষণ নিচে লিখে রাখো :

➲ কী কী ব্যবহার করেছ?

....

....

....

....

....

....

➲ কম্পাস কাছে নেয়ার পর কী ঘটল?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

➲ ব্যাটারির দিক বদলে দেয়ার পর কী ঘটেছে?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

✎ অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে 'বিদ্যুতের চুম্বক ক্রিয়া' ও 'বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় আবেশ' অংশটুকু পড়ে নিয়ে ক্লাসের বাকিদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখো। তোমাদের পর্যবেক্ষণের কারণ কি বুঝতে পেরেছ?

নবম ও দশম সেশন

- চুম্বকের ধর্ম, চুম্বক কীভাবে কাজ করে তা না হয় জানা গেল। এখন প্রশ্ন হলো কম্পাসের ক্ষেত্রে, বা যে কোনো চুম্বকের ক্ষেত্রে এটির দু মেরু সব সময় উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে থাকে কেন?

- এর উত্তরটা তোমরা ইতোমধ্যেই হয়তো জেনেছ। পৃথিবী একটা বিশাল চুম্বক হিসেবে কাজ করে তাই পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুর দিকে চুম্বকের উত্তর মেরু, এবং উত্তর মেরুর দিকে চুম্বকের দক্ষিণ মেরু মুখ করে থাকে। আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে পড়ে নাও। ক্লাসে সবার সঙ্গে আলোচনা করো।

- এখন প্রশ্ন হলো পরিযায়ী পাখিরা কীভাবে কম্পাস ছাড়াই বিশাল দূরত্বেও ঠিকভাবে দিক নির্ণয় করে থাকে। সূর্য বা তারার গতিপথ কাজে লাগানোর পরেও এই পথ চিনতে যা তাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে তা হলো চুম্বক। অবাক হচ্ছো? যদিও এই বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখনো কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তবে খুব সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গেছে পরিযায়ী পাখিদের ঠোঁটের উপর ম্যাগনেটাইট নামক ক্ষুদ্র বস্তুকণা থাকে যার চৌম্বক ধর্ম রয়েছে! এছাড়া তাদের চোখের রেটিনার উপরেও ক্ষুদ্র চৌম্বক কণা তৈরি হয় যা তাদের পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের রেখাগুলো বুঝতে সাহায্য করে। এর ফলে পাখিরা একদম নির্ভুলভাবে পথ চিনে তাদের গন্তব্যে পৌঁছুতে পারে।

- পরিযায়ী পাখিরা আমাদের প্রকৃতির অংশ। কিন্তু আমাদের অজ্ঞতার কারণে অনেক সময় তাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে। শিক্ষক তোমাদের কয়েকটি পত্রিকার সংবাদ দেবেন, সেখান থেকে তোমরা পরিযায়ী পাখি সম্পর্কে কয়েকটি সংবাদ দেখবে। এর বাইরে তোমরা কি এরকম কোনো ঘটনা শুনেছ? শুনলে নিচে লিখে রাখো,

- ইতোমধ্যে তোমরা প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে জেনেছ। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বাস্তুতন্ত্রের প্রতিটি উপাদানের ভূমিকা রয়েছে। পরিযায়ী পাখিরা আমাদের প্রকৃতির অংশ, এরা না থাকলে

আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্য ঠিক থাকবে না। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় পরিযায়ী পাখিদের গুরুত্বের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইনে এদের সুরক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী পরিযায়ী পাখিকে আঘাত করা, দখলে রাখা, ক্রয়-বিক্রয়, পরিবহণ, মাংস ভক্ষণ, শিকার, বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ পেতে ধরা ইত্যাদি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যার সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে আসামী ২ বছর কারাদণ্ড অথবা ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।

তোমাদের এলাকায় পরিযায়ী পাখিদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় গড়ে তুলতে তোমরা কী করতে পারো? দলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নাও, তোমাদের পরিকল্পনা নিচে লিখে রাখো,

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

ক্লাসে বাকিদের সঙ্গেও আলাপ করো। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর নিজের অভিজ্ঞতা অন্যদের জানাতে ভুলো না যেন!

ফিরে দেখা

পরিযায়ী পাখিদের সম্পর্কে নতুন কী কী জানলে এই কাজ করতে গিয়ে?

....
....
....
....
....

এই কাজ করার পর পরিযায়ী পাখিদের বিষয়ে তোমার নিজের চিন্তায় কি কোনো পরিবর্তন এসেছে?

সূর্যঘড়ি

মানুষ যখন ঘড়ি আবিষ্কার করেনি তখন সময়ের হিসাব কী করে রাখত বলো তো? সূর্য ও চাঁদের গতিপথ, আকাশের তারা এই তো ছিল সম্বল! এখন তোমরা জানো, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে, সেজন্য আমরা নিয়মিত সূর্যের উদয় আর অস্ত দেখি। এখন পৃথিবীর এই গতিপথ সারা বছর কি একই রকম? সুর্যের অবস্থানের উপর নির্ভর করে যে আলো-ছায়া আমরা দেখি, তা দিয়ে কি সত্যিই নির্ভুলভাবে সময় বোঝা সম্ভব? চলো দেখা যাক!

প্রথম সেশন

- 'সূর্যঘড়ি' শিরোনাম শুনেই বুঝতে পারছ, এই শিখন অভিজ্ঞতায় তোমাদের কাজ হবে সূর্যকে কাজে লাগিয়ে সময়ের হিসাব করা। কিন্তু সূর্যকে কাজে লাগানোর উপায় কী? সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর কক্ষপথ আমরা কীভাবে বুঝতে পারি? যেহেতু পৃথিবী পুরো এক বছর ধরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ

করে, কাজেই পৃথিবীর কক্ষপথ বুঝতে চাইলে তোমাদেরকেও বছর জুড়ে কিছু পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তবে শুরুতেই এই জটিল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে একটু দেখে নেয়া যাক, সূর্যের আলো পৃথিবীতে কীভাবে এসে পড়ে।

- তোমরা নিজেরা সহজ একটা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিষয়টা খতিয়ে দেখতে পারো। তোমাদের বিদ্যালয়ে পতাকা স্ট্যান্ড আছে নিশ্চয়ই? সারাদিনে এই পতাকা স্ট্যান্ডের ছায়ার কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে তা তোমরা খেয়াল করে দেখতে পারো (পতাকা স্ট্যান্ডের বদলে যে কোনো লম্বা লাঠি বা খুঁটির ছায়া দেখলেও চলে)। তবে পতাকা স্ট্যান্ডের দৈর্ঘ্য ও অবস্থানের কারণে এর ছায়া ঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা বেশ কঠিন। সেক্ষেত্রে একটা লম্বা কাঠি, খুঁটি বা লাঠি খাড়াভাবে এক জায়গায় স্থাপন করে তার ছায়া খেয়াল করতে পারো। তবে এই পর্যবেক্ষণের জন্য খুঁটিটি দিনভর একই জায়গায় স্থির রাখা জরুরি।

- শিক্ষকের সহযোগিতায় ৫/৬ জনের দলে ভাগ হয়ে যাও। বিদ্যালয় শুরুর পর প্রতি ঘণ্টায় পতাকা স্ট্যান্ডের ছায়ার কী পরিবর্তন হয়? তা পর্যবেক্ষণ করে ছক-১ -এ লিখে রাখো।

ছক-১

দলের সদস্যদের নাম:

পর্যবেক্ষণের ক্রমিক	সময় (পূর্ণ ঘণ্টায়)	খুঁটির ছায়ার অবস্থান	খুঁটির ছায়ার দৈর্ঘ্য (ফুট)
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			

বিজ্ঞান ক্লাসে/প্রথম ক্লাসে প্রত্যেক দল পর্যায়ক্রমে খুঁটির ছায়ার পরিবর্তনের প্রথমবারের তথ্য সংগ্রহ করতে পারো। পরের প্রতি ক্লাশে শেষে দলের একজন খুঁটির ছায়ার পরিবর্তনের তথ্য ঐ ছকে সংগ্রহ করো। এভাবে ৫/৬টি পর্যবেক্ষণের তথ্য সংগ্রহ করলেই চলবে। পাশের ছবির মতো একটা কাঠি বা খুঁটি ব্যবহার করেও এর ছায়ার তথ্য রেকর্ড রাখতে পারো। পরের সেশনে এই পর্যবেক্ষণের তথ্য পর্যালোচনা করতে পারবে।

দ্বিতীয় সেশন

আগের সেশনের পর্যবেক্ষণের তথ্য নিয়ে আলোচনা করে দেখো। সারা দিনে পতাকা স্ট্যান্ড বা খুঁটির ছায়া কীভাবে পড়ে? ছায়া কি একই জায়গায় ছিল নাকি বেলা বাড়ার সঙ্গে সরে গিয়েছে? ছায়ার দৈর্ঘ্যের কোনো পরিবর্তন দেখেছ? কেন এমনটি ঘটছে? দলে আলাপ করে দেখো। আলোচনার ভিত্তিতে তোমার উত্তর নিচে লিখে রাখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

- দেখতেই পাচ্ছ, সারাদিন সূর্যের আলো একইভাবে পড়ে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ছায়ার অবস্থান কাজে লাগিয়ে কতটা নিখুঁতভাবে সময় বের করা সম্ভব?

- সূর্যঘড়ির কথা তোমরা কি আগে শুনেছ? আমরা এখন যে আধুনিক ঘড়ি ব্যবহার করি তা আবিষ্কারের আগে সূর্যঘড়িই ছিল মানুষের ভরসা। সূর্যের ছায়ার অবস্থান কাজে লাগিয়ে নিখুঁতভাবে স্থানীয় সময় বের করা সম্ভব, এ কথা মানুষ আবিষ্কার করেছিল বহু আগে। সবচেয়ে প্রাচীন সূর্যঘড়ির অস্তিত্বের কথা জানা যায় প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় (পাশের ছবিতে এর ধ্বংসাবশেষ দেখো)। এর পর বিভিন্ন সময়ে ইউরোপ, এশিয়ার বিভিন্ন সভ্যতায় সূর্যঘড়ি ব্যবহারের কথা জানা যায়।

- বাংলাদেশের কথা চিন্তা করলে আমরা একদিক দিয়ে খুবই ভাগ্যবান, কারণ বলতে গেলে সারা বছরই আমাদের এখানে রোদ পাওয়া যায়, ফলে একান্তই মেঘলা আবহাওয়া না থাকলে দিনের বেলা সূর্যের আলো কাজে লাগিয়ে সময় বের করা এখানে অনেক সহজ। এই সুবিধা কাজে লাগিয়ে একটা সূর্যঘড়ি তৈরি করার চেষ্টা করা যাক, চলো।

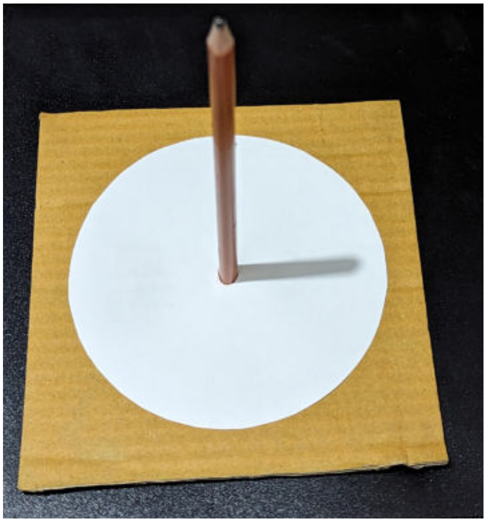

- অনেকভাবে এই সূর্যঘড়ি বানানো যায়, এখানে নমুনা আকারে একটা সহজ মডেল দেয়া হলো। তোমরা দলে ভাগ হয়ে নিজেদের সুবিধা মতো একটা মডেল বানিয়ে নিতে পারো।

- ছবির মতো একটা গোল করে কাটা কাগজ শক্ত

হার্ডবোর্ড বা পুরোনো কার্টনের অংশের উপরে আটকে নাও। এবার এর কেন্দ্র বরাবর একটা কাঠি বা এমনকি পেন্সিল খাড়া দাঁড় করিয়ে নিতে পারো। সময়ের হিসাব রাখতে হবে যেহেতু ছায়ার অবস্থান ঠিকমতো দেখা দরকার, কাজেই এই সূর্যঘড়ি সূর্যের আলোতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে। ভালো হয় এই পর্যবেক্ষণ যদি ঠিক ১২টায় শুরু করতে পারো। দুপুর ১২টায় পেন্সিলের ছায়া যেখানে পড়েছে সেখানে ১২ লিখে চিহ্নিত করে নাও। এবার এক ঘণ্টা পরপর ছায়ার অবস্থান অনুযায়ী সময় বসিয়ে নিলেই হলো।

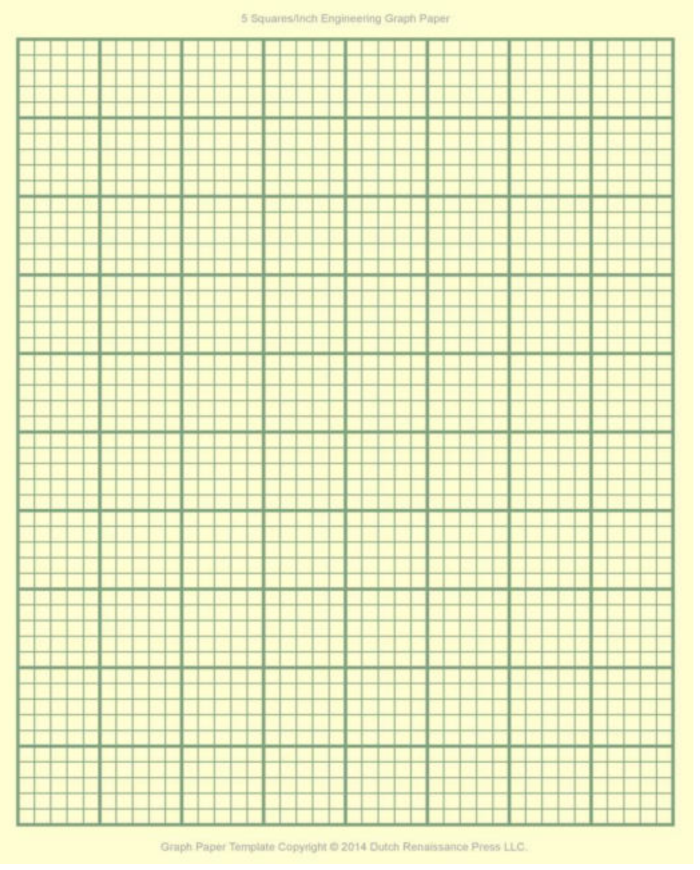

✎ একটু ভেবে দেখো তো, সূর্যঘড়ি ব্যবহার করে কি রাতের সময় দেখা সম্ভব?

✎ এবার অন্য একটা বিষয় আলোচনা করা যাক। ছায়ার অবস্থান নিয়ে তো আলোচনা হলো, কিন্তু ছায়ার দৈর্ঘ্য কি সারাদিন একই থাকে?

✎ আগের সেশনে সংগৃহীত পতাকা স্ট্যান্ড বা খুঁটির ছায়ার পরিবর্তনের ৫/৬টি পর্যবেক্ষণের তথ্য অনুশীলন বইয়ের সংশ্লিষ্ট গ্রাফ কাগজের X অক্ষে সময় (ঘণ্টা) এবং Y অক্ষে ছায়ার দৈর্ঘ্য (ফুট) ধরে তথ্যগুলো স্থাপন করে দেখো। প্রাপ্ত বিন্দুগুলো সংযুক্ত করে রেখাচিত্র এঁকে নাও।

✎ রেখচিত্রের আকার কেমন দাঁড়িয়েছে? ছায়ার দৈর্ঘ্যের এই পার্থক্যের কারণ কী হতে পারে? দলে আলোচনা করে নিচে তোমাদের উত্তর লিখে রাখো।

....

....

....

....

- দলের রেখচিত্র এবং তার ব্যাখ্যা ক্লাসের বাকিদের সঙ্গে আলোচনা করো। দেখো অন্যরা কী লিখেছে।

- প্রয়োজন হলে খাতায় সূর্য ও পৃথিবীর অবস্থান এঁকে নিজেদের যুক্তিগুলো যাচাই করে দেখো।

তৃতীয় ও চতুর্থ সেশন

- আগের সেশনে সূর্য ও পৃথিবীর অবস্থানের ফলে আলো-ছায়া নিয়ে তো হাতে-কলমে কাজ করলে। ছায়া ব্যবহার করে কীভাবে সময় নিরূপণ করা যায় সূর্যঘড়ি তৈরির মাধ্যমে তাও জানলে। এই ছায়া ব্যবহার করে আরও বিস্ময়কর আবিষ্কার মানুষ করেছে, তেমন একটি ঘটনা আজ জেনে নেয়া যাক:

****

এরাটোস্থেনিসের পৃথিবীর পরিধি নির্ণয়ের গল্প

এরাটোস্থেনিসের ছিলেন একজন গ্রিক গণিতবিদ এবং আলেক্সান্দ্রিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরির প্রধান পরিচালক। তিনি কোন একটা বইয়ে পড়েছিলেন—সাইয়িন নগরীতে জুনের ২১ তারিখ ঠিক দুপুরবেলা নাকি সূর্য একেবারে মধ্যগগনে থাকে, এবং খাড়াভাবে পুঁতে রাখা খুঁটির কোনো ছায়া পড়েনা। তিনি খেয়াল করে দেখলেন, আলেক্সান্দ্রিয়ায় ঠিকই ওই দিনের নির্দিষ্ট সময়ে ছায়া পড়ছে। এখন একেক জায়গায় একেকরকম ছায়া পড়ার অর্থ একটাই হতে পারে—পৃথিবী গোল! এখন এটা শুনতে খুব স্বাভাবিক লাগলেও ঐ সময়ে, খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এই কথা বললে খুব কম মানুষই বিশ্বাস করত। এরাটোস্থেনিস তার এই চিন্তা প্রমাণ করতে একটা অদ্ভুত পরিকল্পনা করলেন। এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দিলেন যার কাজ হবে আলেক্সান্দ্রিয়া থেকে

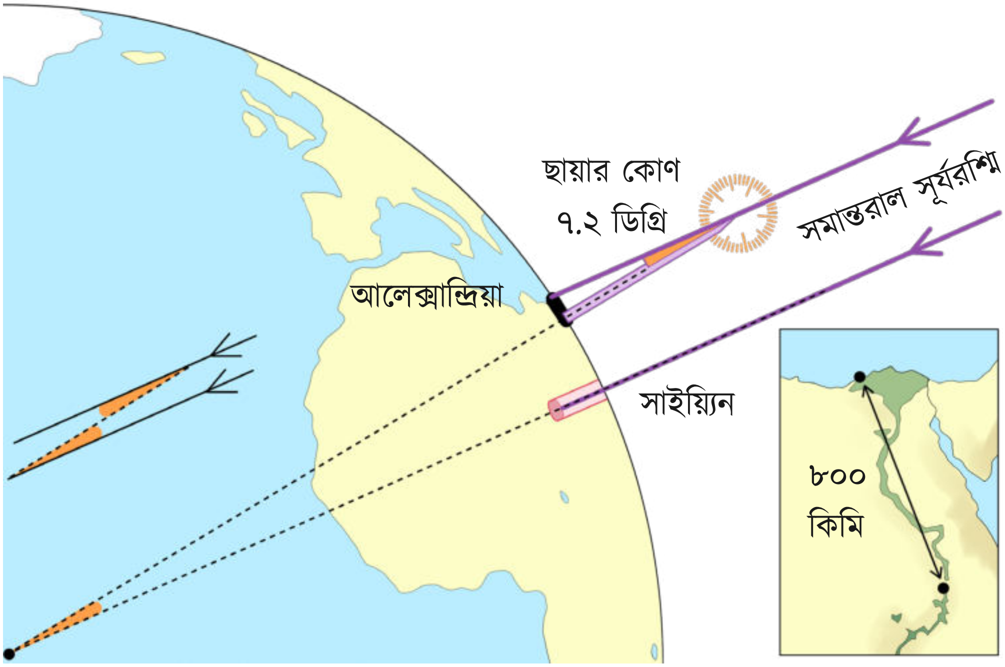

সাইয়্যিন নগরে সোজা পায়ে হেঁটে যাওয়া ও এই দুই শহরের দূরত্ব পরিমাপ করা। যথাসময়ে, তার নিয়োগ দেয়া ব্যক্তি হাঁটা শুরু করলেন, এবং সাইয়্যিন শহরে পৌঁছানোর পর তার দেয়া হিসাব অনুযায়ী এই দুই স্থানের দূরত্ব পাওয়া গেলো ৮০০ কিলোমিটার। এখন পরের ২১শে জুন তিনি খোঁজ নিয়ে জানলেন আদতেই সাইয়্যিন নগরে ঠিক দুপুরে ছায়া পড়ছে না, অর্থাৎ সূর্য একেবারে খাড়া আলো দিচ্ছে। এদিকে একইসময়ে আলেক্সান্দ্রিয়ায় যে ছায়া পড়ছে তার কোণ হল ৭.২ ডিগ্রী। এখন এরাটোস্থেনিস হিসাব করে দেখলেন, যদি পৃথিবী গোল হয়, তাহলে পৃথিবীর কেন্দ্রে এই দুই নগরের মধ্যকার কৌণিক দূরত্বও হবে ৭.২ ডিগ্রী, যা কিনা ৩৬০ ডিগ্রির ৫০ ভাগের এক ভাগ। কাজেই ভূপৃষ্ঠে এই দুই নগরের দূরত্ব ৮০০ কিলোমিটার হলে, পুরো পৃথিবীর পরিধি হবে এর ৫০ গুণ!

এভাবে হিসাব করে তিনি পৃথিবীর পরিধি নিরূপণ করেছিলেন ৮০০ কিমি x ৫০ = ৪০,০০০ কিমি।

অনেক অনেক বছর পরে প্রযুক্তির কল্যাণে যখন সত্যি সত্যি পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করা হল, দেখা গেলো এরাটোস্থেনিস বিস্ময়কর ভাবে বলতে গেলে কোনো প্রযুক্তি ছাড়াই, শুধুমাত্র সূর্যের আলোর ছায়া ব্যবহার করে প্রায় নির্ভুলভাবে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করেছিলেন! আধুনিক হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর পরিধি ৪০,০৭৫ কিমি!

****

- এরাটস্থেসিনের ঘটনা তো জানলে। তিনি একই দিনে পৃথিবীর দুটি বিন্দুতে সূর্যের আলো কীভাবে পড়ে তা থেকে প্রায় নির্ভুলভাবে পৃথিবীর পরিধি হিসাব করে বলেছিলেন। একইভাবে তোমরা কি পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করতে পারবে? দলে আলোচনা করো।

- এখন একটু ভেবে দেখো, একই স্থানে সারাবছর সূর্যের আলো কি একইভাবে পড়ে? নিজেরা ভেবে দেখো। তবে অনুমান থেকে আসলে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া কঠিন। সবচেয়ে ভালো হয় যদি প্রায় বছরজুড়ে সূর্যের আলো কীভাবে পড়ে তা নিজেরা পরীক্ষা করে দেখা যায়। সেজন্য তোমরা একটা সহজ কৌশল নিতে পারো।

- সূর্যের আলো ঠিক কোন জায়গায় পড়ছে তা বোঝার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো একটা বিন্দু বা ছোটো কোনো ছিদ্র দিয়ে আলোকরশ্মি প্রবেশের ব্যবস্থা করে বছরের বিভিন্ন সময়ে সেই আলোকবিন্দু কোথায় পড়ছে তার অবস্থান দেখা।

- শুরুতেই একটা বাক্স জোগাড় করা দরকার। এই কাজের জন্য তোমরা কোনো ছোটো সাইজের কার্টন, বড়ো সাইজের খালি টিস্যু বক্স/কাগজের বক্স ব্যবহার করতে পারো। এর বাইরে তোমাদের যা যা লাগতে পারে তা হলো : এন্টিকাটার, স্কেল, পেরেক, আঠা ইত্যাদি।

- পরের পৃষ্ঠার নমুনা ছবির মতো শুরুতে কাগজের বক্সের চারপাশে কাগজ ও আঠা দিয়ে মুড়ে নাও।

- এখন একটি পেরেক বা সরু তীক্ষ্ণ কিছু দিয়ে বক্সের উপরতলে ছোটো ছিদ্র করে নাও। মূলত এ ছিদ্র দিয়ে সূর্যের আলোকরশ্মি বক্সের ভিতরে রাখা কাগজের উপর পড়বে।

- এবার এন্টিকাটার দিয়ে বক্সের একপাশ আয়তাকারভাবে কেটে একটা বড়ো ফাঁকা করতে হবে। এই ফাঁকা অংশ দিয়ে সহজেই দেখা যাবে সূর্যের আলো উপরের ছিদ্র দিয়ে ঠিক কোন বিন্দুতে পড়ছে।

- এবার একটা সাদা কাগজে অল্প আঠা দিয়ে বক্সের নিচের তলে আলতোভাবে লাগাতে হবে যাতে সূর্যের আলো কোথায় পড়ছে তা চিহ্ন দিয়ে রাখা যায়। বছরব্যাপী পর্যবেক্ষণ শেষে সাদা কাগজটি খুলে ফেলতে হবে, কাজেই আঠা একদম হালকা করে লাগালে ভালো।

- এবার স্কুলে একটা নির্দিষ্ট জায়গা নির্ধারণ করো যেখানে সারা বছর নির্দিষ্ট সময়ে এই পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। অর্থাৎ, বলতে গেলে সারা বছরই যেখানে কম-বেশি রোদ পড়ে।

- এবার দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে নাও, যেই সময়টায় তোমাদের ঠিক করে রাখা জায়গায় রোদ পড়ে। মনে রেখো, সূর্যের আলো বাক্সের ছিদ্র দিয়ে লম্বালম্বি নিচের সাদা কাগজের উপরে ফেলতে হবে, যাতে পর্যবেক্ষণের নোট রাখা যায়। দুপুর বারোটার দিকে যেহেতু সূর্যের আলো মোটামুটি খাড়াভাবে পড়ে, এর কাছাকাছি একটা সময় ঠিক করে নাও।

- এখন তোমাদের কাজ হলো, একদম নির্দিষ্ট একই জায়গায় দিনের নির্দিষ্ট সময়ে বাক্সটা রেখে

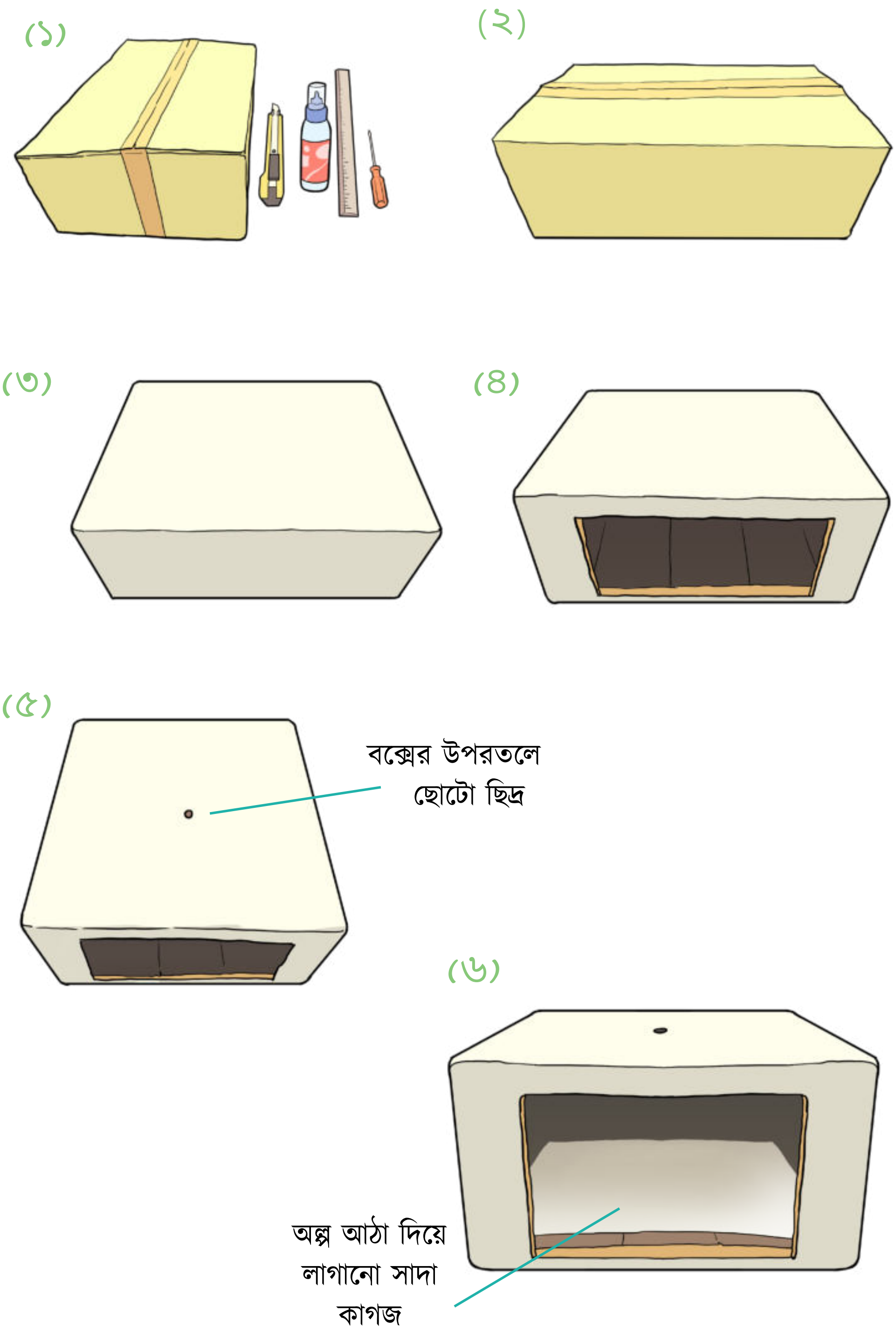
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
বক্সের উপরতলে
ছোটো ছিদ্র
(৬)
অল্প আঠা দিয়ে
লাগানো সাদা
কাগজ

সূর্যের আলো বাক্সের ভেতরে রাখা কাগজের উপরে ঠিক কোন বিন্দুতে পড়ছে তা পর্যবেক্ষণ করা এবং বিন্দুটা কলম বা মার্কার দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা।

- এই পর্যবেক্ষণ করতে হবে বছর জুড়ে, কাজেই তোমাদের বেছে নেয়া জায়গাটা ভালোভাবে চিহ্নিত করে রাখো, চাইলে বাক্সটা কোথায় রাখবে সেখানটা চক বা অন্য কিছু দিয়ে দাগ দিয়েও রাখতে পারো। সব সময় বাক্সটি একই জায়গায় একইভাবে রেখে পর্যবেক্ষণ করো। শিক্ষকের পরামর্শ নিয়ে সিদ্ধান্ত নাও।

- বছরে প্রতিদিন এই কাজ করা কঠিন, কাজেই সপ্তাহে একটা দিন ঠিক করে নাও যেদিন তোমরা এই পর্যবেক্ষণ করবে। পর্যবেক্ষণের পর বাক্সের মধ্যে রাখা কাগজে আলোকবিন্দুর অবস্থান চিহ্নিত করে রাখতে ভুলো না।

- ক্লাসে মোট যতগুলো দল, প্রত্যেক দল সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে এক এক করে পর্যবেক্ষণ সেরে নিতে পারো। তবে আবারও মনে রেখো, বাক্সটা ঠিক একই নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে এই পর্যবেক্ষণ করতে হবে, নাহলে সূর্যরশ্মি আগের দিন ঠিক কোন বিন্দুতে পড়েছিল তার সঙ্গে তুলনা করতে পারবে না।

- একই পর্যবেক্ষণ তোমরা চাইলে নিজের বাসাতেও করতে পারো।

- এই শিখন অভিজ্ঞতার বাকি কাজগুলো আপাতত তোলা থাকুক। বছরের অন্যান্য শিখন অভিজ্ঞতার কাজগুলো তোমরা এগিয়ে নাও। বছর শেষে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে তোমাদের পর্যবেক্ষণের ফলাফল দেখে এই অভিজ্ঞতার বাকি অংশটুকু শেষ করা যাবে।

পঞ্চম সেশন (নভেম্বর)

- সারা বছর ধরে তোমাদের বাক্সের ভেতরে রাখা কাগজে সূর্যরশ্মির অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেছ নিশ্চয়ই। এই পর্যবেক্ষণ নিয়ে আলোচনার আগে একটা ছোট্ট বিষয় জেনে নেয়া যাক।

- সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে জেনেছ, গ্যালাক্সি কীভাবে সৃষ্টি হয়, নক্ষত্রের জন্ম মৃত্যু সবই তোমরা জেনেছ। কিন্তু মহাকাশের এই অসংখ্য বস্তুর মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের যে বস্তু, আমাদের অতিপরিচিত চাঁদ—তার জন্ম কীভাবে হয়েছিল তা কি জানো?

- অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে 'সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ' অধ্যায়ের 'চাঁদের সৃষ্টি' অংশটুকু একবার পড়ে নাও। দলে বসে আলোচনা করো।

- চাঁদের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে সবচেয়ে স্বীকৃত মতবাদ সম্পর্কে তোমরা তো জানলে। এখন এই মতবাদ অনুযায়ী চাঁদের উৎপত্তির ঘটনাপ্রবাহকে তিনটি ধাপে সাজিয়ে নিচের ফ্লোচার্টে দেখাও :

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

এবার একটু ভেবে দেখো, সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের অবস্থানের কারণে কী কী ঘটনা ঘটে? এরকম কিছু ঘটনা তোমরা চট করেই বলতে পারো, যেমন- দিন-রাতের পরিবর্তন, পূর্ণিমা-অমাবস্যা ও চন্দ্রকলা, ঋতু পরিবর্তন, চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণ ইত্যাদি। কিন্তু এই ঘটনাগুলো আসলে কী কারণে ঘটে তা কি বলতে পারো?

সামনের সেশনগুলোতে চলো একে একে দেখে নেয়া যাক; পৃথিবী-সূর্য-চাঁদের এই বিশাল সিস্টেমটা কীভাবে কাজ করে, সময়ের সঙ্গে এদের অবস্থানের পরিবর্তনের ফলাফল হিসেবে কী কী ঘটনা আমরা দেখি, আর এই সিস্টেম কীভাবে একটা ভারসাম্যের মধ্যে থাকে।

প্রথমেই ভালো হয় সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের একটা মডেল বানিয়ে নিলে। তাহলে সেই মডেল পর্যবেক্ষণ করে সহজেই এই বিভিন্ন ঘটনা বুঝতে পারবে। পৃথিবী ও চাঁদ বানানোর জন্য গোল যে কোনো কিছু বেছে নিতে পারো, পুরোনো ফেলে দেয়া উপকরণ ব্যবহার করা গেলে সবচেয়ে ভালো। সূর্যের জায়গায় যে কোনো আলোর উৎস ব্যবহার করতে পারো। এর আগে তোমরা 'যাযাবর পাখিদের সন্ধানে' শিখন অভিজ্ঞতার জন্য সূর্য আর পৃথিবীর মডেল বানিয়েছিলে মনে আছে? চাইলে সেই একই উপকরণ এখানেও ব্যবহার করতে পারো। আর পুরো মডেলকে জোড়া দেয়ার জন্য, এবং ঘূর্ণন অক্ষ দেখানোর জন্য অন্য কী কী ব্যবহার করা যেতে পারে? পৃথিবী ও চাঁদের বিভিন্ন অবস্থান যাতে এদের কক্ষপথে বিভিন্ন অবস্থানে ঘুরিয়ে দেখানো যায় সেজন্য কক্ষপথ তৈরিতে পাতলা স্টিলের তার বা এ জাতীয় কিছু ব্যবহার করতে পারো যা নিচের একটা বেইজের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। কিংবা উপরে একটা তারের ফ্রেম থেকে সুতা দিয়ে ঝুলিয়েও একই কাজ করতে পারো। আনুষঙ্গিক অন্য কী কী লাগতে পারে তাও ভেবে বের করো।

মডেল বানানোর আগে একটা বিষয় আলোচনা করে নেয়া যাক। সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর কক্ষপথ, কিংবা পৃথিবীকে ঘিরে চাঁদের কক্ষপথ পুরোপুরি বৃত্তাকার নয়, বরং কিছুটা চ্যাপ্টা বা উপবৃত্তাকার; এই তথ্য তোমরা অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে জেনেছ। কিন্তু এই চ্যাপ্টা উপবৃত্তাকার কক্ষপথের কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? অর্থাৎ পৃথিবীর কক্ষপথ যদি উপবৃত্তাকার হয়, তাহলে সূর্য ঠিক কোথায় অবস্থিত বলতে পারো? বৃত্তাকার পথ হলে চোখ বন্ধ করে হয়তো বলে দিতে পারতে বৃত্তের কেন্দ্রে সূর্য অবস্থিত, কিন্তু উপবৃত্তের ক্ষেত্রে এর অবস্থান কোথায় হবে? নিচের ছোট্ট কাজটা করে এই বিষয়টা বুঝে নিতে পারো।

- একটা কাগজের উপর এক টুকরো সুতার দু প্রান্ত ঢিলেঢালাভাবে আলপিন গেঁথে বা স্কচটেপ দিয়ে আটকে নাও।
- একটা কলম দিয়ে সুতাটা টানটান করে যে সীমা পর্যন্ত নেয়া যায় সেভাবে টেনে নাও। কাগজে ঘুরিয়ে সুতার সীমা বরাবর দাগ কাটো। পুরো সীমা ঘুরে এলে দেখবে কাগজের উপর একটা উপবৃত্ত আঁকা হয়ে গেছে। এই উপবৃত্তাকার পথের দুটি উপকেন্দ্র হলো সুতার প্রান্ত ঠিক যেই দুটি বিন্দুতে আটকানো সেই দুটি বিন্দু।
- এখন ভেবে দেখো, উপবৃত্তের দুটি উপকেন্দ্র যদি কাছাকাছি হয়, তাহলে এর আকার কেমন হবে? আবার দু প্রান্ত যদি আরও দূরে সরিয়ে দাও তাহলে কি উপবৃত্ত আরও চ্যাপ্টা হবে নাকি প্রায় গোলাকার হবে? সুতার দুপ্রান্ত বিভিন্ন দূরত্বে আটকে এঁকে দেখো।

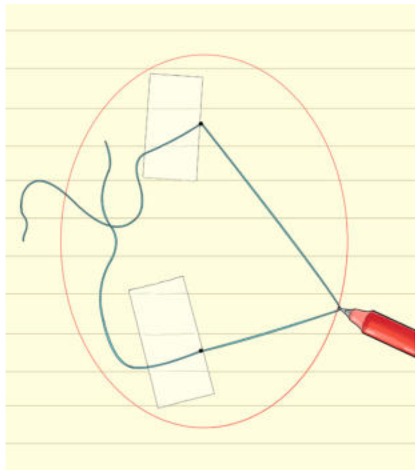

- বুঝতেই পারছ, সুতার দু প্রান্ত, অর্থাৎ উপকেন্দ্র দুটি যত বেশি কাছাকাছি হবে, তোমার কলমে আঁকা পথটা তত গোলাকার বা বৃত্তাকার হবে। যদি কাছাকাছি আনতে আনতে সুতার প্রান্ত দুটিকে একদম একই বিন্দুতে নিয়ে আসা হয়, তাহলে এই পথ হবে পুরোপুরি বৃত্তাকার।
- যেহেতু সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর কক্ষপথ কিছুটা উপবৃত্তাকার, কাজেই পৃথিবীর কক্ষপথে সূর্যের অবস্থান ঠিক মাঝ বরাবর নয়, বরং উপবৃত্তাকার কক্ষপথের দুটি উপকেন্দ্রের মধ্যে কোনো একটিতে। তার মানে, সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবসময় একই থাকে না। একই কথা পৃথিবীকে ঘিরে চাঁদের কক্ষপথের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তোমাদের মডেল বানানোর সময় এই বিষয়টি মাথায় রাখা জরুরি।

✎ মডেল তৈরিতে কী কী উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে তা তোমার দলের অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নাও। উপকরণগুলোর নাম নিচে লিখে রাখো। উপকরণ বাছাই করার কারণ কী সেই যুক্তিও লিখে রাখতে ভুলো না।

- ....
- ....
- ....
- ....

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

- ০ ....
- ০ ....
- ০ ....
- ০ ....
- ০ ....
- ০ ....
- ০ ....

✎ অন্যান্য দলের সঙ্গে মতবিনিময় করে দেখো তাদের পরিকল্পনা কী। শিক্ষকের পরামর্শ নিয়ে তালিকা চূড়ান্ত করো। পরের সেশনে আসার আগে উপকরণগুলো জোগাড় করে আনা চাই।

ষষ্ঠ সেশন

✎ এই সেশনে তোমাদের কাজ হলো নিজ নিজ দলের সঙ্গে মডেল তৈরি করা। আগের অভিজ্ঞতার ('যাযাবর পাখিদের সন্ধানে' শিখন অভিজ্ঞতা) মডেল কাজে লাগিয়েও সেটা করতে পারো। তবে একটা বিষয় মনে রেখো, পৃথিবীসহ মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর আকার এতই বড়ো, এবং এদের মধ্যকার দূরত্ব এতই বেশি যে হাতে বানানো মডেলে এদের তুলনামূলক অবস্থান বা আকার বোঝা বলতে গেলে অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবীর তুলনায় সূর্যের ব্যাস প্রায় ১০৯ গুণ বেশি। আবার চাঁদের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের মাত্র ২৭%। অর্থাৎ চাঁদের তুলনায় সূর্যের ব্যাস প্রায় ৪০০ গুণ বেশি। অপরদিকে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে যে গড় দূরত্ব (১,৫০০ লক্ষ কিলোমিটার) সেটি পৃথিবী ও চাঁদের মাঝে গড় দূরত্ব (৩.৮৪ লক্ষ কিলোমিটার) থেকে ৪০০ গুণ বেশি। কাজেই এদের তুলনামূলক অবস্থান ও আকারের ধারেকাছে কোনো মডেল বানানোও সত্যি বলতে অসম্ভব। আমাদের করণীয় হলো নিজেদের বানানো মডেলে যতটা সম্ভব সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের অবস্থান যৌক্তিকভাবে সাজিয়ে বোঝার চেষ্টা করা যে সত্যিকারে ঘটনাগুলো কীভাবে ঘটছে।

✎ তোমাদের দলের মডেল তৈরি হয়ে গেলে অন্য দলের মডেলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখো। মডেলে সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের অবস্থান যেভাবে দেখানো হয়েছে তা ঠিক আছে কি না কীভাবে বুঝবে? সবচেয়ে ভালো হয় এদের অবস্থানের কারণে আমরা যেসব প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটতে দেখি সেগুলো এই মডেলে পরীক্ষা করে দেখা।

✎ সেশন শেষে মডেল বানানো হয়ে গেলে তোমাদের মডেলগুলো সাজিয়ে রাখো, পরের সেশন থেকে পর্যবেক্ষণ শুরু।

সপ্তম, অষ্টম ও নবম সেশন

- এবার অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের 'সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ' অধ্যায় খোলো। এই অধ্যায়ে পৃথিবী, সূর্য ও চাঁদের অবস্থানের কারণে ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়া আছে।

- দলে বসে উপছায়া ও প্রচ্ছায়া, আংশিক, পূর্ণগ্রাস ও বলয় সূর্যগ্রহণ, সূর্যগ্রহণের প্রভাব ও গুরুত্ব, সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণের উপায় ও প্রয়োজনীয় সতর্কতা, ইত্যাদি সম্পর্কে পড়ে নাও। শিক্ষকের সঞ্চালনায় এই বিষয়গুলো নিয়ে ক্লাসে সবাই মিলে আলোচনা করো।

- এবার তোমাদের বানানো মডেলে সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের অবস্থান পরিবর্তন করে এই বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করে দেখো। কোন কোন ঘটনাগুলো তোমাদের মডেলে দেখাতে পারছ? কোনগুলো দেখানো সম্ভব নয়? কেন? দলে আলোচনা করে তোমাদের উত্তর নিচে লিখে রাখো।

☑ কোন ঘটনাগুলো তোমাদের মডেলে পর্যবেক্ষণ সম্ভব হচ্ছে না?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

☑ উপরের ঘটনাগুলো কেন তোমাদের মডেলে পর্যবেক্ষণ সম্ভব হচ্ছে না?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

- তোমাদের মডেলে প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া কি পর্যবেক্ষণ করতে পারছ? কোনো সমস্যা কি হয়েছে? শ্রেণিকক্ষে দিনের বেলা প্রচ্ছায়া পর্যবেক্ষণ করতে কেন অসুবিধা হয় বলতে পারো?

- একটা ছোটো পরীক্ষা করে দেখো। তোমার একটা হাত সূর্যের আলোর বিপরীতে একটা দেয়াল বা মেঝের একদম কাছাকাছি রেখে দেখো, গাঢ় একটা ছায়া পড়বে। আস্তে আস্তে যদি হাতটা দেয়াল বা মেঝে থেকে সরিয়ে নাও দেখবে ছায়ার রং ফিকে হতে শুরু করেছে। এর কারণ হলো, যতই হাতটাকে দূরে নিচ্ছ, হাতের চারধার থেকে বিভিন্ন আলোর উৎস থেকে আলো এসে ছায়ার অংশটাকে আংশিক আলোকিত করছে। ফলে ছায়া হালকা হতে থাকে। দিনের বেলা আমাদের চারপাশে বিভিন্ন মাধ্যমে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে আসতে থাকে, তাই বিভিন্ন দিকে থেকে আসা আলোর কারণে গাঢ় প্রচ্ছায়া পর্যবেক্ষণ করা কঠিন হয়ে যায়। বরং, অন্ধকার ঘরে শুধু একটি আলোর উৎস থেকে আসা আলোর বিপরীতে প্রচ্ছায়া অনেক ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব।

- একইভাবে বিভিন্ন ধরনের চন্দ্রগ্রহণ; যেমন- পূর্ণ এবং আংশিক চন্দ্রগ্রহণ, উপছায়া চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি সম্পর্কে পড়ে নিয়ে তোমাদের বানানো মডেলের সাহায্যে বিষয়গুলো বুঝতে চেষ্টা করো। নিজেদের দলের সবাই মিলে আলোচনা করো, এরপর শিক্ষকসহ ক্লাসের বাকিদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনায় যোগ দাও।

দশম ও একাদশ সেশন

- প্রায় পুরো বছর জুড়েই তো তোমরা নিজেদের বানানো যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেছ। এবার একটু দেখার পালা যে বছরের বিভিন্ন সময়ে সূর্যের অবস্থান কোথায় ছিল।

- কার্ডবোর্ডের বাক্সের ভেতর থেকে আটকে রাখা কাগজটা সাবধানে বের করে নাও। আগে দেখো সারা বছর সূর্যের আলো কি একই বিন্দুতে পড়েছে? যদি তা না হয়ে থাকে, একটু খেয়াল করে দেখো তো, সূর্যের অবস্থান যে বিন্দুগুলো দিয়ে চিহ্নিত করেছ, সেগুলো একসঙ্গে মিলে কেমন আকৃতি দেখাচ্ছে?

- পরের পৃষ্ঠার ফাঁকা জায়গায় আকৃতিটাকে এঁকে রাখো।

- এবার একটু অন্যান্য গ্রুপের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। তাদের যন্ত্রের ভেতরে রাখা কাগজে কী ধরনের আকৃতি ফুটে উঠেছে?

- তোমাদের বিভিন্ন দলের কাগজে ফুটে ওঠা আকৃতি কি কিছুটা 8 -এর মতো দেখাচ্ছে? এই যে বছর জুড়ে সূর্যের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে তার প্যাটার্নকে বলা হয় অ্যানালেমা। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের 'সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ' অধ্যায় থেকে অ্যানালেমা অংশটা দলে বসে পড়ে নাও।

- পড়া হয়ে গেলে আলোচনা করে দেখো, অবস্থানের এই পরিবর্তনের কারণটা বুঝতে পারছ কি না। ক্লাসের বাকিদের সঙ্গে আলোচনা করো, শিক্ষকের সহায়তা নাও।

- এবার তোমাদের মডেলে বছরের বিভিন্ন দিনে পৃথিবী ও সূর্যের অবস্থান কেমন ছিল তা খুঁজে বের করো তো? আমাদের দেশে সবচেয়ে বড়ো দিন এবং সবচেয়ে বড়ো রাত কোন তারিখে দেখা যায়? কোন কোন তারিখে দিন ও রাত সমান হয়? এই তারিখে বা কাছাকাছি সময়ে সূর্যের অবস্থান কোথায় ছিল তা অ্যানালেমার আকৃতি দেখে বের করার চেষ্টা করো। এবার তোমাদের মডেলে সূর্যের চারদিকে পৃথিবীকে নির্দিষ্ট দূরত্ব ও নির্দিষ্ট কোণে হেলিয়ে বোঝার চেষ্টা করে দেখো; এদের তুলনামূলক অবস্থান বুঝতে চেষ্টা করো। তবে তার আগে পৃথিবীর মডেলে আমাদের দেশের আনুমানিক অবস্থান চিহ্নিত করে নিতে ভুলো না।

- আলোচনার ভিত্তিতে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো:

  ☑ পৃথিবীর কক্ষপথ যদি পুরোপুরি বৃত্তাকার হতো তাহলে অ্যানালেমার আকৃতি কেমন হতো? কেন?

☑ পৃথিবী যদি ২৩.৫ ডিগ্রি হেলে না থেকে একদম খাড়াভাবে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরত তাহলে অ্যানালেমার আকৃতি কেমন হতো? যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করো।

☑ পৃথিবীর সব দেশ থেকে বছর জুড়ে পর্যবেক্ষণ করলে কি অ্যানালেমার আকৃতি একইরকম হবে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

- আগেই জেনেছ, বাংলাদেশে আমরা যারা থাকি তারা একদিক দিয়ে খুবই ভাগ্যবান, কারণ বলতে গেলে সারা বছরই আমাদের এখানে রোদ পাওয়া যায়। কখনও কি ভেবে দেখেছ এর কারণ কী?

- এর আগে তোমরা ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক সম্পর্কে জেনেছ। আর তোমরা ইতোমধ্যেই জানো বাংলাদেশের ঠিক উপর দিয়ে গেছে কর্কটক্রান্তি রেখা। যেহেতু পৃথিবী ঠিক ২৩.৫ ডিগ্রি হেলে থাকে, বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের আলো ঠিক খাড়াভাবে কর্কটক্রান্তির উপরে পড়ে, সেই তারিখটা হলো ২১শে জুন।

- এই সময়ে পৃথিবী ও সূর্যের অবস্থান কেমন থাকে তা কি তোমরা তোমাদের মডেলে দেখাতে পারবে?

দ্বাদশ সেশন

- তোমরা ইতোমধ্যেই জেনেছ, পৃথিবীর কক্ষপথ পুরোপুরি বৃত্তাকার নয়, বরং কিছুটা চ্যাপ্টা বা উপবৃত্তাকার। কাজেই সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সব সময় একইরকম থাকে না। পৃথিবীর ২৩.৫ ডিগ্রি কোণে হেলে থাকার কারণে আমরা ঋতু পরিবর্তন হতে দেখি তা তোমরা ইতোমধ্যেই জানো। এখন ভেবে দেখো, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের কারণে কি পৃথিবীর জলবায়ু প্রভাবিত হতে পারে? দলে আলোচনা করে তোমাদের অনুমান জানাও।

- এবার অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের একই অধ্যায় থেকে পৃথিবীর কক্ষপথ ও অক্ষের পরিবর্তন অংশটুকু পড়ে নাও। দলে আলোচনা করে তোমাদের ধারণা মিলিয়ে নাও। শিক্ষকসহ ক্লাসের বাকিদের সঙ্গে আলোচনা করে ধারণা স্পষ্ট করার চেষ্টা করো। এবার তোমাদের আগের অনুমান মিলিয়ে নাও।

- এই শিখন অভিজ্ঞতায় যা যা নতুন জানলে তার আলোকে এবার নিজেদের বানানো মডেলটিকে ভালোভাবে যাচাই করে দেখো। পৃথিবী, সূর্য ও চাঁদের অবস্থান তোমরা যেভাবে দেখিয়েছ তা কি যৌক্তিক মনে হচ্ছে? এই মডেলে কি তোমরা যেসব প্রাকৃতিক ঘটনার কথা জেনেছ (যেমন: বিভিন্ন ধরনের সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ, উপচ্ছায়া ও প্রচ্ছায়া, অনুসুর ও অপসুর, ইত্যাদি) সেগুলো দেখানো সম্ভব হয়েছে? মডেলে কোনো পরিবর্তন আনলে কি আরও যৌক্তিকভাবে এই বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা যেত? নিচে তোমাদের উত্তর লিখে রাখো।

....

....

....

....

....

....

....

ফিরে দেখা

তোমাদের বানানো সূর্যঘড়ি কি সারাবছর একইভাবে কাজ করবে? ভেবে ব্যাখ্যা করো।

ছায়ার অবস্থান ও দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন কাজে লাগিয়ে আর কী কী করা যেতে পারে?

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

....
....
....
....
....
....

সোলার প্যানেল কোনদিকে হেলিয়ে রাখা হয় কখনো খেয়াল করেছ? কেন সোলার প্যানেলকে সবসময় একই দিকে মুখ করে হেলিয়ে রাখা হয় বলতে পারো?

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

সবুজ বন্ধু

স্কুলে বা স্কুলের বাইরে তোমাদের তো অনেক বন্ধুবান্ধব। সবাই যে মানুষ, এমনও নয়। অনেকে বিড়াল বা কুকুর পোষে, তারাও আমাদের চারপেয়ে বন্ধু। কেমন হয় যদি কোনো একটা গাছের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হয়? অনেকে হয়তো ভ্রু কুঁচকে ভাবছ, গাছ তো কথাই বলতে পারে না, তার কোনো আবেগ অনুভূতিও নেই, সে আবার বন্ধু হবে কী করে? সত্যিই কি গাছের অনুভূতি নেই? চলো, একটু খুঁটিয়ে দেখি!

প্রথম সেশন

- বাঙালি বিজ্ঞানীদের নাম বলতে গেলে প্রথমেই যার নাম চলে আসে তাকে তোমরা সবাই চেন— স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। গাছের যে প্রাণ আছে, গাছ যে আমাদের মতোই জীবন্ত সত্তা, তা বহু আগ থেকেই অনেকে বিভিন্ন সময়ে ধারণা করেছেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র বসুই প্রথম একেবারে প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন যে, গাছের সংবেদনশীলতা আছে; বিভিন্ন উদ্দীপনায় সে সাড়া দেয়।
- এখন তোমরা ভেবে থাকতে পারো, যে এই সাড়া দেয়ার মানে কী? গাছ ঠিক কতটা 'জীবন্ত'? তারা কি সত্যিই আমাদের বন্ধু হতে পারে?
- এই অভিজ্ঞতায় গাছ নিয়ে তোমরা অনেক গভীরভাবে জানার সুযোগ পাবে। তবে তার আগে একটা লেখা পড়ে নাও। লেখক আর কেউ নয়, স্বয়ং জগদীশচন্দ্র বসু। পৃথিবীর অনেক বড়ো বড়ো বিজ্ঞানীর মতো তিনিও শুধু যে আজীবন গবেষণা করেছেন তাই না, বড়োদের জন্য তো বটেই এমনকি ছোটোদের জন্যেও অনেক সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন।
- এবার একটু সময় নিয়ে নিচের লেখাটা পড়ে নাও।

****

গাছের কথা

জগদীশচন্দ্র বসু

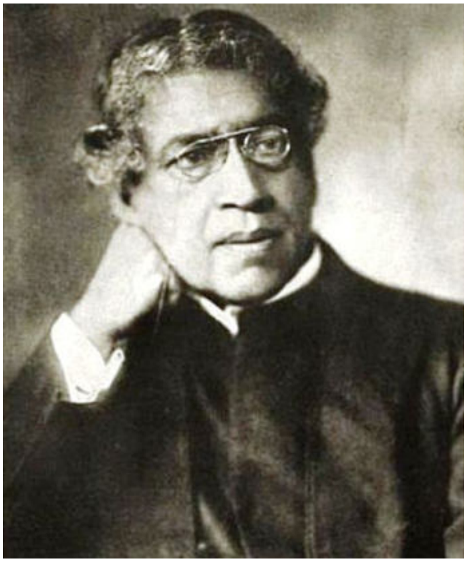

গাছেরা কি কিছু বলে? অনেকে বলিবেন, এ আবার কেমন প্রশ্ন? গাছ কি কোন দিন কথা কহিয়া থাকে? মানুষেই কি সব কথা ফুটিয়া বলে? আর যাহা ফুটিয়া বলে না, তাহা কি কথা নয়? আমাদের একটি খোকা আছে, সে সব কথা ফুটিয়া বলিতে পারে না; আবার ফুটিয়া যে দু চারিটি কথা বলে, তাহাও এমন আধ-আধ ও ভাঙ্গা-ভাঙ্গা যে, অপরের সাধ্য নাই তাহার অর্থ বুঝিতে পারে। কিন্তু আমরা আমাদের খোকার সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারি। কেবল তাহা নয়। আমাদের খোকা অনেক কথা ফুটিয়া বলে না; চক্ষু, মুখ ও হাত নাড়া, মাথা নাড়া প্রভৃতির দ্বারা আকার ইঙ্গিতে অনেক কথা বলে, আমরা তাহাও বুঝিতে

পারি, অন্যে বুঝিতে পারে না। একদিন পার্শ্বের বাড়ী হইতে একটি পায়রা উড়িয়া আসিয়া আমাদের বাড়ীতে বসিল; বসিয়া গলা ফুলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। পায়রার সঙ্গে খোকার নূতন পরিচয়; খোকা তাহার অনুকরণে ডাকিতে আরম্ভ করিল। পায়রা কি-রকমভাবে ডাকে? বলিলেই ডাকিয়া দেখায়; তদ্ভিন্ন সুখে দুঃখে, চলিতে বসিতে, আপনার মনেও ডাকে। নূতন বিদ্যাটা শিখিয়া তাহার আনন্দের সীমা নাই।

একদিন বাড়ি আসিয়া দেখি, খোকার বড় জ্বর হইয়াছে; মাথার বেদনায় চক্ষু মুদিয়া বিছানায় পড়িয়া আছে। যে দুরন্ত শিশু সমস্ত দিন বাড়ি অস্থির করিয়া তুলিত, সে আজ একবার চক্ষু খুলিয়াও চাহিতেছে না। আমি তাহার বিছানার পাশে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম। আমার হাতের স্পর্শে খোকা আমাকে চিনিল এবং অতি কষ্টে চক্ষু খুলিয়া আমার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর পায়রার ডাক ডাকিল। ঐ ডাকের ভিতর আমি অনেক কথা শুনিলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম, খোকা বলিতেছে, "খোকাকে দেখিতে আসিয়াছ? খোকা তোমাকে বড় ভালোবাসে।" আরও অনেক কথা বুঝিলাম, যাহা আমিও কোন কথার দ্বারা বুঝাইতে পারি না।

যদি বল, পায়রার ডাকের ভিতর এত কথা কি করিয়া শুনিলে? তাহার উত্তর এই- খোকাকে ভালবাসি বলিয়া। তোমরা দেখিয়াছ, ছেলের মুখ দেখিয়া মা বুঝিতে পারেন, ছেলে কি চায়। অনেক সময় কথারও আবশ্যক হয় না। ভালবাসিয়া দেখিলেই অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

আগে যখন একা মাঠে কিংবা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম তখন সব খালি-খালি লাগিত। তার পর গাছ, পাখী, কীট পতঙ্গদিগকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি। সে অবধি তাদের অনেক কথা বুঝিতে পারি, আগে যাহা পারিতাম না। এই যে গাছগুলি কোন কথা বলে না, ইহাদের যে আবার একটা জীবন আছে, আমাদের মতো আহার করে, দিন দিন বাড়ে, আগে এ সব কিছুই জানিতাম না; এখন বুঝিতে পারিতেছি। এখন ইহাদের মধ্যেও আমাদের মতো অভাব, দুঃখ-কষ্ট দেখিতে পাই। জীবনধারণ করিবার জন্য ইহাদিগকেও সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। কষ্টে পড়িয়া ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ চুরি ডাকাতি করে। মানুষের মধ্যে যেরূপ সদ্‌গুণ আছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু দেখা যায়। বৃক্ষদের মধ্যে একে অন্যকে সাহায্য করিতে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে একে অপরের সহিত বন্ধুতা হয়। তারপর মানুষের সর্ব্বোচ্চ গুণ স্বার্থত্যাগ—গাছে তাহাও দেখা যায়। মা নিজের জীবন দিয়া সন্তানের জীবন রক্ষা করেন। সন্তানের জন্য নিজের জীবন-দান উদ্ভিদেও সচরাচর দেখা যায়। গাছের জীবন মানুষের জীবনের ছায়া মাত্র। ক্রমে এ সব কথা তোমাদিগকে বলিব।

তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল সকলেই দেখিয়াছ। মনে করো, কোন গাছের তলাতে বসিয়াছ। ঘন সবুজ পাতায় গাছটি ঢাকা, ছায়াতে তুমি বসিয়াছ। গাছের নীচে এক পার্শ্বে একখানি শুষ্ক ডাল পড়িয়া আছে। এক সময় এই ডালে কত পাতা ছিল, এখন সব শুকাইয়া গিয়াছে, আর ডালের গোড়ায় উই ধরিয়াছে। আর কিছুকাল পরে ইহার চিহ্নও থাকিবে না। আচ্ছা, বল তো—এই

গাছ আর এই মরা ডালে কি প্রভেদ? গাছটি বাড়িতেছে; আর মরা ডালটা ক্ষয় হইয়া যাইতেছে; একে জীবন আছে, আর অন্যটিতে জীবন নাই। যাহা জীবিত, তাহা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। জীবিতের আর একটি লক্ষণ এই যে, তাহার গতি আছে, অর্থাৎ তাহারা নড়ে চড়ে। গাছের গতি হঠাৎ দেখা যায় না। লতা কেমন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাছকে জড়াইয়া ধরে, দেখিয়াছ?

জীবিত বস্তুতে গতি দেখা যায়; জীবিত বস্তু বাড়িয়া থাকে। কেবল ডিমে জীবনের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ডিমে জীবন ঘুমাইয়া থাকে। উত্তাপ পাইলে ডিম হইতে পাখির ছানা জন্মলাভ করে। বীজগুলি যেন গাছের ডিম; বীজের মধ্যেও এরূপ গাছের শিশু ঘুমাইয়া থাকে। মাটির উত্তাপ ও জল পাইলে বীজ হইতে বৃক্ষশিশুর জন্ম হয়।

(সংক্ষেপিত)

****

- পড়া হয়ে গেছে? কেমন লাগল? তোমার পাশের বন্ধুর সঙ্গে বসে তোমার অনুভূতি তাকে জানাও। ক্লাসের বাকিদের লেখাটি পড়ে কেমন লাগল তাও জেনে নাও।

- এবার একটু ভেবে দেখো, তোমাদের চারপাশে কত ধরনের গাছ, তাদের কথা কি তুমি শুনতে পাও? জগদীশচন্দ্র বসু লিখেছেন, গাছ আমাদের মতোই—ভালবেসে তাদেরকেও কাছে টানা যায়, তাদের কথা শুনতে না পেলেও মনের ভাব বুঝতে পারা যায়।

- সমস্যাটা হচ্ছে, বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে দেখলে তথ্য প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছু মেনে নেয়ার উপায় নেই। জগদীশচন্দ্র বসু তাই নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন গাছ কীভাবে উদ্দীপনায় সাড়া দেয় তা রেকর্ড করার জন্য। কিন্তু গাছ আদৌ ‘কথা বলে কি না’ বা অর্থবহ শব্দ উৎপন্ন করে কি না তা উনি ওই সময়ের প্রযুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে যেতে পারেননি।

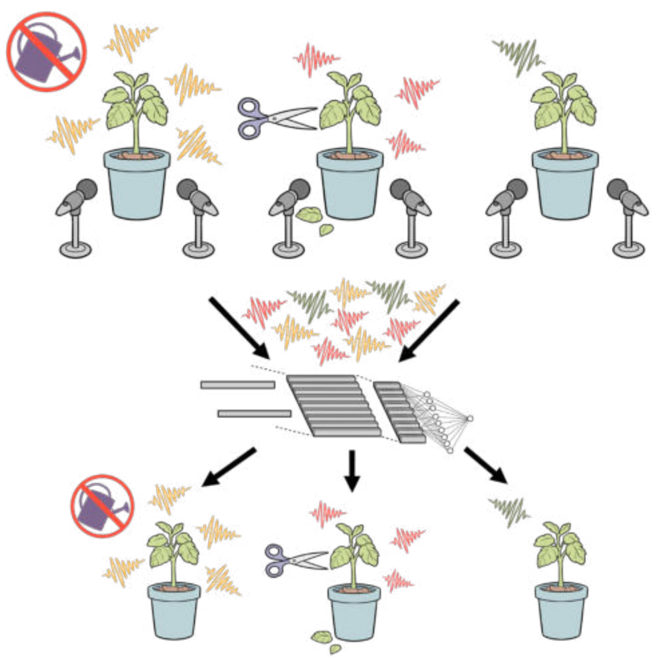

- এখন একটা চমকপ্রদ খবর তোমাদের জানাই। বিশ্বের একেবারে প্রথম সারির বৈজ্ঞানিক জার্নাল ‘সেল’ এ খুব সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে গাছ সত্যি

সত্যিই শব্দ উৎপন্ন করে। শুধু তাই নয়, সেই শব্দ রেকর্ড করে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গাছ যখন সুস্থ থাকে, ভালো থাকে—মানে 'হাসিখুশি' অবস্থায় গাছ যে ধরনের শব্দ তৈরি করে তার চেয়ে কষ্টে থাকা, ক্ষুধার্থ বা তৃষ্ণার্ত গাছের শব্দ একেবারে আলাদা। পাশের ছবিতে খুব সরল করে বিষয়টা দেখানো হয়েছে খেয়াল করো। গাছকে যখন ঠিকমতো পানি দেয়া হচ্ছে না, তার ডাল কেটে ফেলা হচ্ছে, তখন সে বিভিন্ন রকম শব্দ তৈরি করছে। কিন্তু সুস্থ অবস্থায় একই গাছ যে শব্দ তৈরি করছে, বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে এই শব্দ থেকে সেগুলো একেবারে আলাদা! আরও অবাক করা বিষয় কি জানো? এই সূক্ষ্ম শব্দ আমাদের কান পর্যন্ত না পৌঁছুলেও অনেক ছোটো ছোটো প্রাণী যেমন ইঁদুর এই শব্দগুলো ঠিকই শুনতে পায়!

- আমাদের চারপাশে যে শব্দের সমুদ্র, দুঃখের বিষয় হলো তার অনেক শব্দই আমরা কখনও শুনতে পাই না!

- এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা গাছকে আরেকটু আপনভাবে দেখার চেষ্টা করে দেখি চলো।

- এই ক্লাসের সকল শিক্ষার্থী, এবং তোমাদের শিক্ষক সবাই এই শিখন অভিজ্ঞতায় একটি গাছের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে। সেই গাছটি কী গাছ হতে পারে তোমরাই ঠিক করে নাও। প্রত্যেকেই একটি গাছের চারা রোপণ করে তাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে, তাকে ভালোভাবে বুঝতে, অনুভব করতে চেষ্টা করবে। কারো বাড়ির সামনে ফাঁকা জায়গায় গাছটি রোপণ করতে পারো, আবার কেউ চাইলে বারান্দার টবেও গাছটাকে বড়ো করতে পারো। তোমাদের শিক্ষকও একটি গাছ রোপণ করবেন, তার পরিচর্যা করবেন, সেই গাছটি স্কুলেই রাখা থাকবে, তোমরাও এই পরিচর্যায় শিক্ষককে সাহায্য করতে পারো।

- তোমরা কে কোন গাছ রোপণ করতে চাও, সেই গাছের চারা কীভাবে জোগাড় করা যায় তা ছোটো

ছোটো দলে ভাগ হয়ে আলোচনা করে নাও। শিক্ষকসহ বাকিদের সঙ্গে নিজেদের চিন্তা বিনিময় করো।

- তুমি কোন গাছ রোপণ করবে সিদ্ধান্ত নিয়েছ? নিচে গাছটার নাম লিখে রাখো,

  ....

- পরের সেশনে আসার আগে যার যার গাছের চারা জোগাড় করা চাই কিন্তু!

দ্বিতীয় সেশন

- এই সেশনে আসার আগেই নিশ্চয়ই তোমরা যে যার গাছের চারা জোগাড় করতে পেরেছ? এবার এই গাছগুলো যত্ন করে বড়ো করার পালা। সেজন্য তোমাদের স্কুলে যিনি গাছের পরিচর্যা করেন তার সাহায্য নিতে পারো। কিংবা, তোমাদের স্কুলে এমন কেউ না থাকলে স্থানীয় নার্সারিতে কাজ করেন কিংবা এই কাজের অভিজ্ঞতা আছেন এমন অভিভাবক বা বড়ো ক্লাসের কারো সাহায্য নিতে পারো। সপ্তম শ্রেণিতে তোমাদের গাছের পরিচর্যা নিয়ে কিছুটা অভিজ্ঞতা তো হয়েছেই।

- শিক্ষকের গাছটি রোপণ করতে সবাই সাহায্য করো, আর এর মাধ্যমে সবাই গাছ রোপণ করার প্রাথমিক ধারণা নিয়ে নাও। বাড়িতে গিয়ে সবাইকেই তো নিজের গাছটি রোপণ করতে হবে। তোমাদের এই নতুন সবুজ বন্ধুকে ভালো রাখতে কীভাবে পরিচর্যা করতে হবে তা অভিজ্ঞ পরিচর্যাকারীর কাছ থেকে জেনে নাও।

বাড়ির কাজ

আজ বাড়ি ফিরে গাছ রোপণ করতে গিয়ে তোমার কী অভিজ্ঞতা হলো তা নিচের ফাঁকা জায়গায় লিখে রাখো,

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

তৃতীয় ও চতুর্থ সেশন

- তোমাদের সবুজ বন্ধু, প্রিয় গাছ এখন প্রতিদিন একটু একটু করে বেড়ে উঠবে; ঠিক যেভাবে তোমরাও জন্মের পর থেকে একটু একটু করে বেড়ে উঠছ। এক সময় তোমরাও শিশু ছিলে, সেখান থেকে এখন তোমরা কৈশোরে পৌঁছেছ, এক সময় পূর্ণবয়স্ক মানুষে পরিণত হবে। কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছ, কীভাবে একটা ছোট্ট মানুষ কিংবা ছোট্ট গাছের চারা আস্তে আস্তে বড়ো হয়ে ওঠে? তোমরা সপ্তম শ্রেণিতে দেহের কোষ সম্পর্কে জেনেছ, উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের গঠন, সাদৃস্য-বৈসাদৃশ্য সবই জেনেছ। এখন দেখার পালা, এই কোষগুলো কীভাবে তোমার দেহের বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

- তোমাদের অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে কোষ বিভাজন ও তার রকমভেদ অধ্যায়টি বের করো। দেহের বৃদ্ধি সম্পর্কে জানার আগে, কোষ সম্পর্কে আরেকটু জেনে নেয়া জরুরি। ছোটো ৫/৬ জনের দলে ভাগ হয়ে যাও। দলে বসে কোষ বিভাজনের গুরুত্ব ও কোষের গঠন সম্পর্কে পড়ে নাও। পড়ার পর শিক্ষকের সহযোগিতায় ক্লাসের বাকিদের সঙ্গে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো কোষের অভ্যন্তরে নিউক্লিয়াসের ভেতরে ক্রোমোজোমগুলো কীভাবে বিন্যস্ত থাকে।

- এবার কোষ কীভাবে বিভাজিত হয় এবং জীবদেহের বৃদ্ধি ও বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলমান রাখে তা জেনে নেয়া যাক। অ্যামাইটোসিস, মাইটোসিস ও মিয়োসিস এই তিনটি প্রক্রিয়া সম্পর্কে তোমরা একে একে জানবে। প্রথমে অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়া সম্পর্কে জেনে নাও।

- তোমার বা তোমার সবুজ বন্ধুর দেহকোষে কি অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজন ঘটে? একটু ভেবে নিয়ে দলে আলোচনা করে দেখো। যুক্তিসহ তোমাদের উত্তর নিচে লিখে রাখো।

....

....

....

....

....

....

....

- এবার মাইটোসিস কোষ বিভাজন সম্পর্কে জানা যাক। মাইটোসিস কোষ বিভাজন মূলত বহুকোষী জীবের দেহের বৃদ্ধি ঘটায়। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের পুরো প্রক্রিয়াটি পড়ে নিয়ে দলে আলোচনা করো। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব সম্পর্কেও জেনে নিও।

- এবার ধাপগুলোর মডেল তৈরি করে দেখা যায়, তাতে সবার ধারণা অনেক বেশি স্পষ্ট হবে। সবাইকে পুরো প্রক্রিয়ার সবগুলো ধাপের মডেল বানাতে হবে এমন কিন্তু নয়। বরং প্রত্যেক দল লটারির মাধ্যমে এক একটি ধাপ নির্বাচন করে নাও, যার মডেল তৈরির মাধ্যমে বাকিদের সেই ধাপটি সম্পর্কে বুঝিয়ে বলতে পারবে।

- মডেল তৈরিতে কী কী ব্যবহার করবে দলে আলোচনা করো। মনে রেখো, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, কিংবা খরচসাপেক্ষ উপকরণ যত কম ব্যবহার করা যায় তত ভালো। বরং পরিত্যক্ত বা আগে ব্যবহৃত জিনিস দিয়ে মডেল বানানো যায় কি না দেখো। দলে আলোচনা করে কী কী উপকরণ ব্যবহার করবে তার একটা তালিকা তৈরি করে ফেলো। পরের সেশনে শ্রেণিকক্ষে বসেই মডেলটা তৈরি করবে।

পঞ্চম সেশন

- এই সেশনে মডেল তৈরির পালা। দলে কে কোন অংশে কাজ করবে তা প্রথমেই ঠিক করে নাও। প্রত্যেকে নিজেদের ভূমিকা ঠিকঠাক পালন করলে কাজটা দ্রুত হবে। উপকরণ নিশ্চয়ই আগেই সংগ্রহ করা শেষ? সেগুলো কাজে লাগিয়ে আজকে সবাই মিলে দলের মডেলটা তৈরি করে নাও।

- এবার প্রতিটি দল নিজ নিজ দলের বানানো মাইটোসিস কোষ বিভাজনের বিভিন্ন ধাপের মডেল প্রদর্শন করবে। এখন একটা মজার কাজ করা যায়। নিজেদের মডেল তো কতই উপস্থাপন করেছ, অন্য দলের বানানো মডেল তোমরা উপস্থাপন করলে কেমন হয়?

- লটারির মাধ্যমে আবার যে কোনো একটি ধাপ বেছে নাও। এই ধাপ নিয়ে যারা কাজ করেছে এমন কোনো গ্রুপের বানানো মডেল উপস্থাপন করো। একইভাবে প্রত্যেক দলই তার নিজের কাজ বাদে অন্য কোনো দলের বানানো মডেল উপস্থাপন করবে, অন্য শিক্ষার্থীরা তাদের কথা শুনবে, প্রশ্ন করবে।

ষষ্ঠ সেশন

- গত কিছুদিনে তোমাদের গাছটা কতখানি বেড়ে উঠল? একটা আলাদা ডায়রিতে এক সপ্তাহ অন্তর

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অন্তর গাছটি কতটুকু বড়ো হচ্ছে তা নোট করে রাখো। আর গাছটির যত্ন নিতে তুমি কী কী ব্যবহার করেছ, তাও লিখে রেখো।

- মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে কীভাবে তুমি বা তোমার সবুজ বন্ধু কীভাবে বেড়ে ওঠে তা তো জানলে। শরীরের ক্ষুদ্র কোষের ক্ষুদ্রতর নিউক্লিয়াসের ভেতরে কি নিয়ন্ত্রিত, সুশৃঙ্খলভাবে এই কোষ বিভাজনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে ভেবে দেখেছ? আচ্ছা, কখনো যদি এই প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়? সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে কী ঘটবে? অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে জেনে নাও।

- দেহের বৃদ্ধি কী করে হয় তা তো জেনেছ। এখন একবার ভেবে দেখো, তোমার এই দেহটি এক সময় কিন্তু ছিল না। মানুষের বা অন্য বহুকোষী জীবের জন্ম, বংশবৃদ্ধির সময়ে আরেক ধরনের কোষ বিভাজন ঘটে, তাকে বলে মিয়োসিস। এবার এই কোষ বিভাজন সম্পর্কে জেনে নেয়া যাক চলো।

- আগের মতোই দলে ভাগ হয়ে মিয়োসিস কোষ বিভাজন সম্পর্কে পড়ে নাও। ক্লাসে সবার সঙ্গে মিয়োসিস কোষ বিভাজনের পুরো প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করো।

- মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোষ বিভাজনের মধ্যে মূল পার্থক্যটা কী বলতে পারো?

সপ্তম ও অষ্টম সেশন

- তোমাদের সবুজ বন্ধু কেমন আছে? এবার তাদের অর্থাৎ উদ্ভিদদের সম্পর্কে আরেকটু খুঁটিয়ে জেনে নেয়া যাক চলো। তোমার নিজের রোপণ করা গাছটিকে নিশ্চয়ই তুমি ভালোভাবেই লক্ষ করেছ? ওর দেহে কী কী অঙ্গ রয়েছে সেগুলো কি বলতে পারো? পরের পৃষ্ঠার ছকে লিখে রাখো,

তোমার উদ্ভিদের নাম	উদ্ভিদটির বিভিন্ন অঙ্গ

উদ্ভিদের কোষ সম্পর্কে তোমরা ইতোমধ্যে জেনেছ। তোমার দেহের কার্যকরী একক যেমন- কোষ, উদ্ভিদেরও তাই। এর আগে তোমরা জেনেছ যে, মানবদেহের গঠন ও কাজ বুঝতে বিজ্ঞানীরা কোন ধাপগুলো অনুসরণ করেন। সেগুলো হলো,

কোষ > টিস্যু বা কলা > অঙ্গ > তন্ত্র

এখন উদ্ভিদের দেহের গঠন ও কাজ বুঝতেও আমাদের কাছাকাছি একটা ধারাবাহিকতায় আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। উদ্ভিদ কোষ সম্পর্কে তোমরা ইতোমধ্যে জানো। মানবদেহের মতোই উদ্ভিদদেহের নির্দিষ্ট কোনো কাজ সমাধা করার জন্য একাধিক কোষ মিলে নির্দিষ্ট রকমের টিস্যু বা কলা তৈরি করে, সেই টিস্যুগুলো আবার সেই সুনির্দিষ্ট কাজগুলো করার জন্য নির্দিষ্ট অঙ্গ গঠন করে। এখন টিস্যু কতরকম হয়, সেগুলো কীভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার টিস্যুর ধরন সম্পর্কে জেনে নাও।

এর আগে তোমার উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ তো শনাক্ত করেছ, এবার তোমাদের অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ে দেয়া উদ্ভিদের অঙ্গগুলোর সঙ্গে তোমার তালিকাটি মিলিয়ে নাও। এমন কোনো অঙ্গের কথা কি আছে যেটি তোমার উদ্ভিদের দেহে দেখা যায় না? থাকলে সেটি নিচে টুকে রাখো।

....

....

....

....

....

✎ এবার ভেবে দেখো তোমার শনাক্ত করা অঙ্গসমূহের কথা। উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের কী কী কাজ তা তো ইতোমধ্যেই জানলে, এবার কোন অঙ্গ কোন কোন ধরনের টিস্যু দিয়ে গঠিত অনুমান করার চেষ্টা করো তো?

তোমার উদ্ভিদের নাম	উদ্ভিদটির বিভিন্ন অঙ্গ	কোন কোন ধরনের টিস্যু দিয়ে গঠিত

নবম ও দশম সেশন

✎ তোমাদের গাছগুলো বাড়িতে কেমন বেড়ে উঠছে? আর শ্রেণিকক্ষে রাখা তোমাদের শিক্ষকদের গাছটি? এই যে বেশ তরতাজা গাছটি দেখছ, এই গাছটিকে ভালো রাখতে সর্বক্ষণ তার শরীরে বেশ কিছু প্রক্রিয়া চলমান। সুস্থ ও ভালো থাকতে তোমার শরীরের যেমন- শ্বাসপ্রশ্বাস, খাওয়া-দাওয়া, রেচন ও বর্জ্য নিষ্কাশনসহ নানা শারীরবৃত্তীয় কর্মকাণ্ড চালু রাখতে হয়, গাছেরও তো তাই। গাছের এই প্রক্রিয়াগুলো কেমন? শ্বাসপ্রশ্বাস বা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য তৈরির কথা তোমরা ইতোমধ্যেই জানো। কিন্তু উদ্ভিদের কোষ এবং টিস্যুসমূহ কীভাবে এদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় চলো জেনে নেয়া যাক।

✎ অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যেমন—ব্যাপন ও প্রস্বেদন সম্পর্কে জেনে নাও। উদ্ভিদের পরিবহণ ব্যবস্থা সম্পর্কে পড়ে নিয়ে দলে আলোচনা করো। এই পুরো আলোচনায় কয়েকটি নতুন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তোমরা পরিচিত হলে,

- ব্যাপন
- প্রস্বেদন
- অভিস্রবণ

✎ এই প্রক্রিয়াগুলোর কোনটি উদ্ভিদের খাদ্য তৈরি ও গ্রহণ, শ্বাসপ্রশ্বাসে কীভাবে সাহায্য করে বলতে পারো? দলে আলোচনা করে তোমার উত্তর নিচে লিখে রাখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

একাদশ সেশন

✎ উদ্ভিদ নিয়ে অনেক আলোচনা হলো। তোমার রোপণ করা গাছটি ভালো আছে কি না খেয়াল করছ তো? বেশ খানিকটা নিশ্চয়ই বেড়ে উঠেছে এর মধ্যে?

✎ তোমাদের সহপাঠীরা তো নানা ধরনের গাছ রোপণ করেছ, কিন্তু কোনটা কোন ধরনের গাছ? তুমিসহ তোমার দলের সদস্যদের গাছের নামগুলো নিচে লিখে রাখো।

দলের সদস্যদের নাম	কী গাছ রোপণ করেছে?

এবার ভেবে দেখো, এদের মধ্যে কোন কোন গাছের মিল বেশি? কোন কোন গাছ দেখতে কিছুটা একই রকম? কিংবা কোন কোন গাছের ফুল, ফল বা পাতার ধরনে সাদৃশ্য বেশি? দলে আলাপ করে শনাক্ত করো।

এই যে তোমরা সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদগুলোর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে, উদ্ভিদবিজ্ঞানীরাও বিভিন্নভাবে গাছদের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন। এই গবেষণার উপর ভিত্তি করে গোটা উদ্ভিদজগৎকে তারা বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিন্যাস করেছেন।

অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে জীবের শ্রেণিবিন্যাস অধ্যায়ের উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস অংশটুকু পড়ে নাও। দলে আলোচনা করো। তোমাদের শিক্ষকের উদ্ভিদটি কোন শ্রেণির মধ্যে পড়ে? ক্লাসের সবাই আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নাও।

এবার তোমাদের কাজ হলো তোমাদের দলের প্রত্যেকের বন্ধু গাছটি কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত তা শনাক্ত করা। বিভিন্ন শ্রেণির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নাও। দলে আলোচনা করে নিচের ছকে নোট নাও। (উদাহরণ হিসেবে একটি উদ্ভিদের নাম ও তার শ্রেণিবিন্যাস নিচে দেয়া হলো।)

দলের সদস্যদের নাম	কী গাছ রোপণ করেছে?	কোন শ্রেণিভুক্ত
(উদাহরণ)	শিম গাছ	সপুষ্পক উদ্ভিদ > আবৃতবীজি উদ্ভিদ > দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ

- অনেক আলোচনা হলো। তোমাদের সবার সবুজ বন্ধুদের সম্পর্কেও অনেক জানা শোনা হলো। পরের সেশনে সবাই মিলে একটা মেলার আয়োজন করতে পারো, যেখানে তোমরা সবাই তার নিজের উদ্ভিদ সম্পর্কে অন্যদের জানানোর চেষ্টা করবে। নিজের সবুজ বন্ধু সম্পর্কে কীভাবে জানাতে চাও তা তুমি ঠিক করে নাও। তোমার গাছটি কীভাবে বেড়ে উঠছে, কীরকমভাবে তুমি তার যত্ন করছ, এই গাছে ফুল বা ফল ধরেছে কি না, গাছটির সঙ্গে তোমার অভিজ্ঞতা, মজার কোনো গল্প—এ সবকিছু নিয়েই আলাপ করতে পারো; কিংবা অন্য যে কোনো কিছু। টবে লাগানো ছোটো গাছ হলে সঙ্গে করে নিয়েও আসতে পারো, আর সেটা সম্ভব না হলে ছবি এঁকে আনতে পারো। ওইদিন তোমার উপস্থাপনা কেমন হবে তা তুমিই ঠিক করে নাও।

- জগদীশচন্দ্র বসু বলেছিলেন, ভালোবাসলে গাছপালার মনের কথাও বুঝতে পারা যায়। তুমি কি এখন তোমার সবুজ বন্ধুটির কথা বুঝতে পারো?

দ্বাদশ সেশন

- আজকের মেলায় তোমার যত্নে গড়ে তোলা গাছ, তোমার সবুজ বন্ধুকে নিয়ে সবাইকে জানার সুযোগ করে দাও। অন্যদের গাছ সম্পর্কেও জানার চেষ্টা করো।

- এই পুরো শিখন অভিজ্ঞতা শেষে মানুষের সঙ্গে গাছের কী কী মিল খুঁজে পেলে? নিচে লিখে রাখো।

ফিরে দেখা

তোমার বন্ধু গাছটির নিয়মিত পরিচর্যার জন্য তুমি কী কী করে থাকো?

....
....
....
....
....
....
....
....
....

এই গাছ যত্ন করে বড় করতে গিয়ে তোমার নতুন কী উপলব্ধি হয়েছে?

....
....
....
....
....
....
....
....
....

তোমার সবুজ বন্ধুকে নিয়ে কোনো বিশেষ স্মৃতি কি আছে যা তুমি মনে রাখতে চাও?

....
....
....
....
....
....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ফিল্ড ট্রিপ

ঘুরতে গিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলো সহজ করে হাতেকলমে শিখে নিলে কেমন হয় বলো তো? এই অভিজ্ঞতায় তোমরা নিজেরাই একটা ভ্রমণ পরিকল্পনা করে সেখান থেকে দূরত্ব, সরণ, দ্রুতি, বেগ, ত্বরণ ইত্যাদি রাশিগুলো সম্পর্কে জানবে ও পরিমাপ করতে শিখবে।

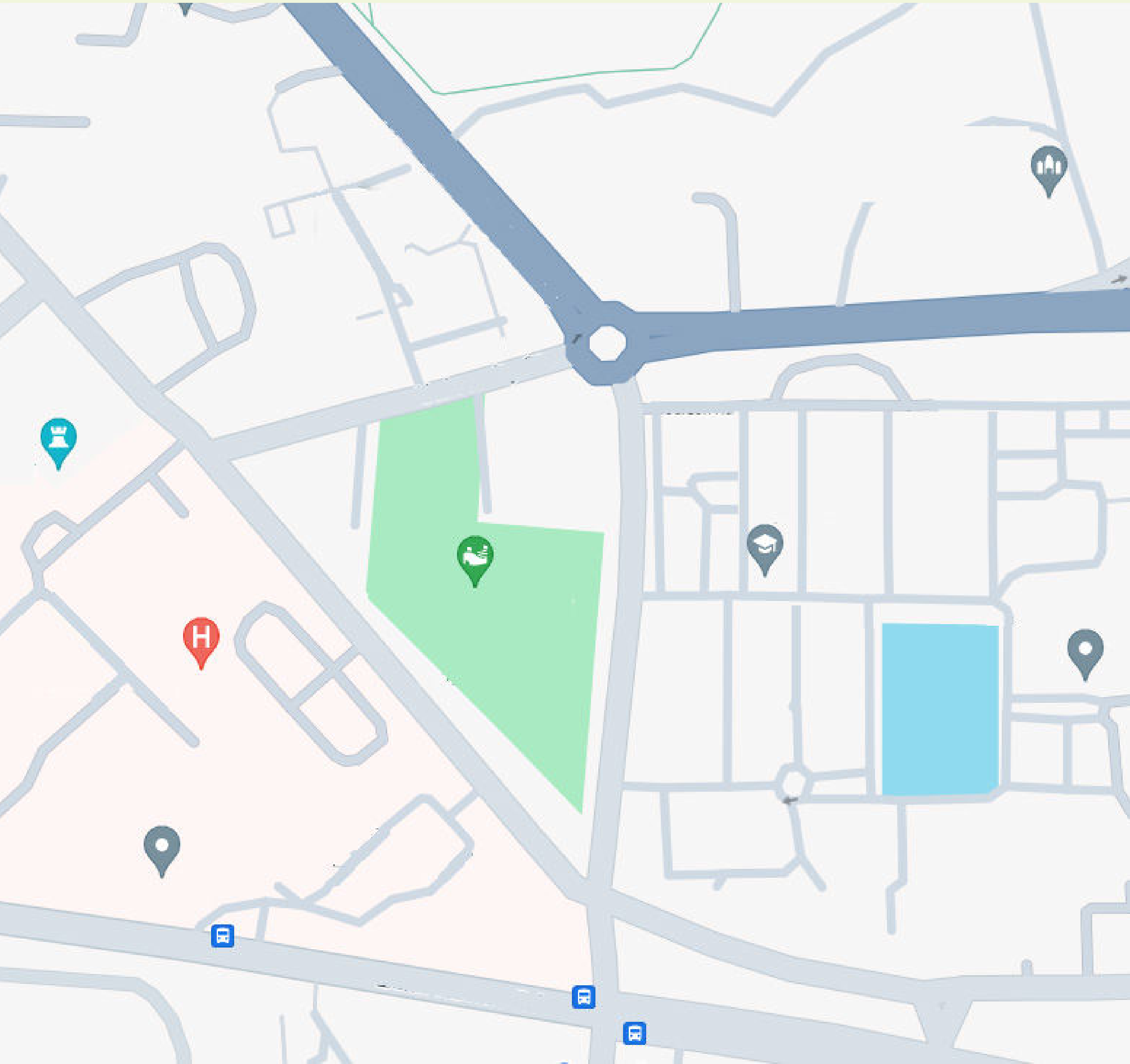

প্রথম ও দ্বিতীয় সেশন

- বাসা থেকে বিদ্যালয়ে তো সব সময় আসা-যাওয়া করো কিন্তু কখনো কী বাসা থেকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার রাস্তার ম্যাপটা দেখেছ? অনেকেই হয়তো মোবাইল ফোনে গুগল ম্যাপে দেখে থাকতে পারো কিন্তু নিজেরা এঁকে বন্ধুদেরকে নিজের বাসাটা চিনিয়ে দেওয়া আরও মজার কাজ হবে নিশ্চয়ই!

- কল্পনা করো তো, স্কুলের ব্যাগটা কাঁধে চাপিয়ে বাড়ির দরজা থেকে শুরু করে কীভাবে, কোন দিক দিয়ে তোমাকে বিদ্যালয়ে আসতে হয়। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হেঁটে আসো, কেউ সাইকেল চালিয়ে আসো, কেউ বা রিকসা-ভ্যানে অথবা অন্য কোনো যানবাহনে চরে আসো। এবার তোমার বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে আসার পথটা নিচের খালি জায়গাতে কল্পনা করে আঁকো। আঁকার সময় আশপাশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা অথবা স্থান বা অন্য কোনো কিছু যেমন– নদী, পুকুর, হাসপাতাল, হাইওয়ে ইত্যাদি থাকলে সেগুলো আলাদাভাবে লিজেন্ড এঁকে চিহ্নিত করো। যেমন–

হাসপাতালের জন্য একরকম চিহ্ন, জলাশয়ের জন্য একরকম চিহ্ন, কিংবা তোমার বাড়ির জন্য একরকম চিহ্ন।

- এবার একটু ভেবে দেখো তো, তোমার বাসা থেকে বিদ্যালয়টা কোন দিকে, আসতে কত সময় লাগে, কীসে করে আসো? এসব তথ্য তোমার পাশের সহজপাঠীর সঙ্গে শেয়ার করে নাও।

- কল্পনা করে তো ম্যাপ আঁকা হলোই, এবার যদি সত্যিকার ম্যাপ ব্যবহার করে একটা ফিল্ড ট্রিপ বা ভ্রমণের পরিকল্পনা করলে কেমন হয়? তাহলে চলো, সেই পরিকল্পনা করে ফেলা যাক।

- শিক্ষকের নির্দেশে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে যাও। এবার দলে আলোচনা করে ঠিক করো বিদ্যালয়ের কাছাকাছি কোথায় ঘুরতে যাওয়া যায়। পরিকল্পনার সময় নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করে ফিল্ড ট্রিপ পরিকল্পনা করো।

  - ☑ কোথায় যাবে
  - ☑ কীভাবে যাবে
  - ☑ কবে যাবে
  - ☑ অনুমতি পাওয়ার বিষয়
  - ☑ খরচ/বাজেট
  - ☑ যদি সম্ভব হয় অন্যান্য বিষয়ের কিছু কাজও এই ভ্রমণে করে ফেলতে পারো

- যদি বিদ্যালয়ের বাইরে যাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে বিদ্যালয়ের ভেতরেই এই কাজটা এমনভাবে করতে হবে যাতে মজা করেই বিষয়গুলো শিখে নেওয়া যায়।

- ভ্রমণ পরিকল্পনা তোমাদের ডায়েরি অথবা খাতায় নোট করে ফেলো। ঠিক করে নাও এই ভ্রমণে কে কী কাজ করবে। নিচের কাজগুলো করার জন্য একটি দল থেকে কয়েকজন দায়িত্ব নিয়ে নাও।

  - ☑ ঘড়ি/স্টপওয়াচ দেখে সময়ের হিসাব রাখা
  - ☑ বিদ্যালয় থেকে কতদূরে যাচ্ছো তার হিসাব রাখা

- যদি বিদ্যালয়ের বাইরে ফিল্ড ট্রিপ হয় তাহলে আনুষঙ্গিক আরও কিছু বিষয়, যেমন—

  - ☑ খাবারের দায়িত্ব
  - ☑ নিরাপত্তার দায়িত্ব
  - ☑ প্রতিবেদন লেখার দায়িত্ব ইত্যাদি ভাগাভাগি করে নাও
  - ☑ অন্য কোনো বিষয়ের কাজ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ ও নির্দেশনা

- প্রত্যকটা দল গুগল ম্যাপ ব্যবহার করে অথবা আঞ্চলিক ম্যাপ ব্যবহার করে একটি খসড়া ম্যাপও নিজেদের খাতায় এঁকে নাও। সেখানে বিদ্যালয় থেকে ভ্রমণের স্থানে যানবাহন অথবা হেঁটে বা অন্য কোনো উপায়ে কীভাবে যাবে সেসব খুঁটিনাটি এঁকে রাখতে পারো। এক্ষেত্রে তোমরা শিক্ষকের সাহায্য নিতে পারো কিংবা বাড়িতে মোবাইল ফোন অথবা কম্পিউটার ব্যবহার করেও কাজটি করতে পারো। আর যদি আঞ্চলিক ম্যাপের হার্ড কপি জোগাড় করে নিতে পারো তাহলে তো আরও ভালো হয়।

- অন্যদিকে যদি বিদ্যালয়ের ভেতরেই ভ্রমণের আয়োজন করতে হয় তাহলে তোমাদের শ্রেণিকক্ষ থেকে একেকটা দল একেক স্থানে যাবে, যেমন হতে পারে— তোমাদের শ্রেণিকক্ষ থেকে বিদ্যালয়ের শহীদমিনার অথবা দূরের আরেকটি শ্রেণিকক্ষ, কিংবা কোনো একটি গাছ ইত্যাদি। এক্ষেত্রেও তোমরা আনুমানিক দূরত্ব ও সময় হিসাব রাখার পাশাপাশি খাতায় একটি সরল ম্যাপ এঁকে নেবে।

তৃতীয় ও চতুর্থ সেশন

- আজ তোমাদের ফিল্ড ট্রিপের দিন। নিশ্চয়ই তোমরা অনেক আনন্দিত! ভ্রমণটা সুন্দরভাবে করার জন্য তোমরা অবশ্যই দায়িত্বশীল আচরণ করবে। এর পাশাপাশি বিজ্ঞানের কাজটাও মজা করে করবে।

- ফিল্ড ট্রিপের দিন সম্ভব হলে একটি জিপিএস ডিভাইজ অথবা স্মার্টফোন ব্যবহার করে স্কুল থেকে তোমাদের গন্তব্যের পথটা দেখে নাও। মোবাইল ফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই শিক্ষকের কাছ থেকে অনুমতি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা শুনে নিতে হবে।

- যে পথে যাচ্ছো তা গুগল ম্যাপ এপ্লিকেশনে দিয়ে নাও। কত দূরত্ব তা খাতায় নোট নাও। যদি তোমরা কোনো বাস অথবা মাইক্রোবাসে ভ্রমণ করো তাহলে চালকের সামনের ড্যাশবোর্ডের স্পীডোমিটারের তথ্যগুলোও সাবধানে শিক্ষকের নির্দেশে একজন একজন করে দেখতে পারো।

- আর তোমাদের দলের যে টাইম-কিপার অর্থাৎ সময়ের হিসাব রাখছো সম্ভব হলে রাস্তার ল্যান্ডমার্ক দেখে প্রতি কিলোমিটার যেতে কত সময় লাগছে তা খাতায় টুকে রাখো। ল্যান্ডমার্ক যদি না থাকে তাহলে মোবাইল ফোনে দেখে নাও। আর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছাতে কতক্ষণ সময় লেগেছে সেটিও খাতায় নোট রাখো।

- অন্যদিকে বিদ্যালয়ের ভেতরেই যদি তোমাদের রুট হয় কিংবা বিদ্যালয় থেকে খুব একটা বেশি দূরে নয় এমন কোথাও সেক্ষেত্রেও প্রত্যেকটা দল যেখান থেকে তোমরা যাত্রা শুরু করেছ সেখান থেকে গন্তব্যের দূরত্ব গজ ফিতা অথবা লাঠি দিয়ে মিটার স্কেল বানিয়ে মেপে নাও। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হেঁটে যেতে কত সময় লাগছে সেটির হিসাব রাখো।

- এ সবকিছু শেষ হয়ে গেলে শ্রেণিকক্ষে ফিরে প্রত্যেকটা দল তোমাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করো। এক দল যখন নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করবে অন্য দল মনোযোগ দিয়ে শুনবে। কী ভালো

লাগল, কী কী নতুন জানলে এসব সবার সঙ্গে শেয়ার করো।

✎ এবার ফিল্ড ট্রিপের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কয়েকটি রাশি সম্পর্কে ভালোভাবে জানবে। প্রথমে জেনে নেওয়া যাক, দূরত্ব ও সরণ সম্পর্কে। তোমাদের অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে 'দূরত্ব ও সরণ' অংশটুকু ভালো করে পড়ে নাও।

✎ পড়া হয়ে গেলে বলো তো, তোমার বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের যে ম্যাপটা এঁকেছিলে সেখানে দূরত্ব কোনটি ও সরণ কোনটি? ছবিতে পেন্সিল অথবা ভিন্ন রঙের কালির কলম দিয়ে এঁকে দেখাও। অনুমান করে মানও কী বলতে পারবে?

✎ এই মুহূর্তে তুমি যেখানে অবস্থান করছো সেখান থেকে তোমাদের শ্রেণির ব্ল্যাকবোর্ডের দূরত্ব ও সরণ অনুমান করে বলতে পারবে?

✎ একটা জিনিস কী লক্ষ করেছ, ব্ল্যাকবোর্ড যেহেতু স্থিরই আছে কিন্তু তোমরা একেকজন একেক বেঞ্চে বসেছো তাই তোমাদের একেকজনের অবস্থান থেকে ব্ল্যাকবোর্ডের দূরত্ব ও সরণ ভিন্ন, তাই না? তোমার কী মনে হয়, বস্তুর অবস্থান পরিবর্তন একটি আপেক্ষিক বিষয়?

✎ অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ে দূরত্ব ও সরণ পরিমাপের আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া আছে দেখে নিয়ে পাশের সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করে নাও তো।

✎ দূরত্ব ও সরণের হিসাব তো হলো, এবার কোন দল আগে গন্তব্যে পৌঁছেছে তার তো হিসাব করতে হবে। যদি আলাদা দল হিসবে না গিয়ে একত্রেও গিয়ে থাকো তাহলে গড় হিসাব করে নেবে।

✎ তোমরা যখন ভ্রমণে গিয়েছিলে তখন শুরু থেকে গন্তব্যের দূরত্বকে যদি যেতে কত সময় লেগেছে তা দিয়ে ভাগ করো তাহলে ঐ সময়ের গড় দ্রুতি পেয়ে যাবে। গড় দ্রুতি থেকে বুঝতে পারবে কোন দল কতো দ্রুত অথবা কত ধীরে গিয়েছে।

✎ খাতায় যে নোট রেখেছিলে সেখান থেকে তথ্য নিয়ে নিচে হিসাবটা করে ফেলো তো।

দ্রুতি, $v = s/t$

দূরত্ব, s = ____km = ____m

সময়, t = ____min = ____s

✎ তুমি যে মান পেলে তার অর্থ কী বলতে পারবে?

তুমি যদি দ্রুতি ব্যাপারটা বুঝে থাকো তাহলে খুব সহজেই বেগ বলতে কী বুঝায়—সেটি বুঝে যাবে। বেগের ক্ষেত্রে দিকটাও যদি তুমি নির্দিষ্ট করে দাও তাহলে বেগের মান পেয়ে যাবে। অর্থাৎ স্কুলের গেট থেকে সোজা কোন দিক বরাবর তোমাদের গন্তব্য ছিল তা যদি তুমি একটি সরলরেখা বরাবর দাগ টেনে সরণ বিবেচনা করো এবং সেই মানকে সময় দিয়ে ভাগ করো তাহলে বেগের মান পেয়ে যাবে। এক্ষেত্রে মানের পাশাপাশি দিকটাও বলে দিতে হবে। আমরা যদি সরল রেখায় গতি নিয়ে হিসেব নিকেশ করি তাহলে বেগ আর দ্রুতির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এক্ষেত্রেও আমরা গড় দ্রুতির মতো আমরা গড় বের করি।

তুমি এখন আশপাশের বিভিন্ন বস্তুর বেগ ও দ্রুতি মাপতে পারবে? চলো একটা খেলার মাধ্যমে কাজটা করা যাক।

চারজন মিলে একেকটি দল তৈরি করে নাও। তোমাদের বসার টেবিল অথবা বেঞ্চের দৈর্ঘ্য রুলার দিয়ে মেপে নাও। যেহেতু আন্তর্জাতিকভাবে দৈর্ঘ্যের একক মিটার তাই মিটার এককে রূপান্তর করে নিতে পারো। ইঞ্চি অথবা সে.মি. কিংবা ফুট একক ধরে করলেও সমস্যা নেই। (1 ইঞ্চি= 0.0254 মিটার)

বেঞ্চের একপাশ দুজন মিলে একটু তুলে ধরো যাতে একটি ramp এর মতো ঢালু তল তৈরি হয়। এবার তোমাদের কলম অথবা চক অথবা এক টুকরো ইট/পাথর উপর থেকে নিচের দিকে গড়িয়ে দাও।

উপর থেকে নিচের কিনার পর্যন্ত যেতে কতক্ষণ সময় লাগছে তা ঘড়িতে হিসাব রাখো। সঙ্গে ঘড়ি না থাকলে ‘এক হাজার এক’ এই শব্দ তিনটি স্বাভাবিকভাবে বলতে যত সময় লাগে তা মোটামুটি এক সেকেন্ড ধরে নিয়ে হিসেব করতে পারো।

এভাবে ঢালের কম বেশি করে দ্রুতি নির্ণয় করে নিচের ছকে লিখো।

বেঞ্চটি মাটি থেকে কতটুকু উঁচুতে (মি. বা সেমি.)	দূরত্ব (s) m	সময় (t) s	দ্রুতি, $v = s/t$ ms^{-1}

আর বেগ কত হবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, বলোতো দেখি?

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সেশন

- এর আগের সেশনে তোমরা যখন বেঞ্চটাকে কম বেশি ঢালু করে দ্রুতি নির্ণয় করেছ তখন নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যখন বেঞ্চটা বেশি ঢালু হয়ে ছিল অর্থাৎ বেঞ্চের একপ্রান্ত মাটি থেকে বেশি উঁচুতে ছিল তখন যে বস্তুটাকে গড়িয়ে দিয়েছিলে সেটি দ্রুত নিচে পড়েছিল।

- তোমরা যদি কেউ ঢালু বেয়ে দৌড়ে নিচে নামার চেষ্টা করে থাকো তাহলে প্রথম দিকে তোমার বেগ বেশ কম থাকলেও ঢালু বেয়ে যতই নিচে নামতে থাকবে তোমার বেগ ততই বেড়তে থাকবে। সাইকেল, গাড়ি কিংবা বাস যখন স্থির অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করে দেখবে ধীরে ধীরে এর বেগ বাড়তে থাকে। আবার এর উল্টোটাও ঘটে, বেঞ্চটাকে ঢালু করে কোনো বস্তুকে এর তল ঘেঁষে উপরের দিকে ছুড়ে মারো তাহলে প্রথম দিকে বেগ বেশি থাকলেও দেখবে উপরে উঠতে উঠতে বেগ ধীরে ধীরে কমে যেতে যেতে একপর্যায়ে শূন্য হয়ে যায়ে। তখন বস্তুটা নিচের দিকে পড়তে থাকবে।

- সময়ের সঙ্গে বেগের বেড়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে ত্বরণ এবং কমে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে মন্দন।

- এখন তোমার মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন আসছে ত্বরণ বা মন্দন কেমন করে হয়। অনুসন্ধানী পাঠ বই তোমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। 'ত্বরণ কেমন করে হয়' অংশটুকু পড়ে নাও। কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে শিক্ষককে করে ধারণা স্পষ্ট করে নাও।

- বইয়ে চার ধরনের বল ও যে উদাহরণগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো একটু নিজে নিজে ভেবে দেখো। আর যদি কখনো এমন না দেখে থাকো তাহলে আজই বাড়িতে গিয়ে অথবা পাশের সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করে কাজটি করে ফেলো।

- এই সেশনে তোমরা পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে একটু গণিত জুড়ে দিয়ে গতির সমীকরণ বানাতে শিখবে এবং মজার মজার সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

- চলো প্রথমেই অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে 'বেগের সমীকরণ' দেখে নেওয়া যাক।

- সেখানে গতির প্রথম যে সমীকরণ তুমি পেলে, $v = u + at$ তুমি যদি কোনো বস্তুর শুরুর বেগ এবং ত্বরণ জানো তাহলে একটি নির্দিষ্ট সময় পর বস্তুটির বেগ কত হবে তা এই সমীকরণের সাহায্যে বের করে ফেলতে পারবে।

- যেমন— তোমরা যখন ভ্রমণে গিয়েছিলে তখন যদি গাড়ির স্পিডোমিটার দেখে থাকো এবং ত্বরণ জেনে থাকো তাহলে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় পর গাড়িটি কত বেগে চলছে তা বের করতে পারবে।

- এরকম একটা উদাহরণ তোমাদের অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ে দেওয়া আছে। নিজে প্রশ্নটা পড়ে

সমাধানের চেষ্টা করে দেখো তো।

- আরেকটি গাণিতিক সমস্যা দেওয়া হলো নিচের ফাঁকা জায়গাতে অথবা খাতায় সমাধান করো।

- $25ms^{-1}$ বেগে চলন্ত একটি গাড়িতে 4s যাবৎ 5 ms^{-2} হারে বেগ বৃদ্ধি পেল। গাড়িটির শেষ বেগ কত হবে?

- স্থির অবস্থান থেকে একটি ট্রেন যাত্রা শুরু করে সমত্বরণে 2 মিনিট চলার পর $35ms^{-1}$ বেগ প্রাপ্ত হয়। ট্রেনটির ত্বরণ কত?

- গতির দ্বিতীয় সমীকরণ 'দূরত্বের সমীকরণ' অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে দেখে নাও। দেখো তো, গড়বেগ থেকে প্রথম সমীকরণ ব্যবহার করে কীভাবে $S = ut + \frac{1}{2} at^2$ সমীকরণ পাওয়া গেল।

- এই সমীকরণ সংক্রান্ত অনুসন্ধানী পাঠে যে উদাহরণ দেওয়া আছে তা তোমার খাতায় সমাধান করো।

- তুমি চাইলে এই সমীকরণ ব্যবহার করে পঞ্চম সেশনে বস্তুর ত্বরণ বের করেছিলে তা আরও সহজে বের করতে পারো। সেক্ষেত্রে- $u=0$ ms^{-1} ধরলে, $S = \frac{1}{2} at^2$ বা, $a = 2S/t^2$

- অর্থাৎ মোট অতিক্রান্ত দূরত্বর দ্বিগুণকে যদি ঐ দূরত্ব অতিক্রম করতে কত সময় লেগেছে তার বর্গ দিয়ে ভাগ করো তাহলে তুমি ত্বরণ পেয়ে যাবে। চাইলে তুমি আবার করে দেখতে পারো।

- দ্বিতীয় সমীকরণ ব্যবহার করে আরও কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করো।

- এর আগে প্রথম সমীকরণ ($v = u + at$) ব্যবহার করে গাড়ির শেষ বেগ বের করেছিলে মনে আছে? গাড়িটি ঐ ত্বরণ নিয়ে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে বলতে পারবে? নিচে হিসাব করে বের করো।

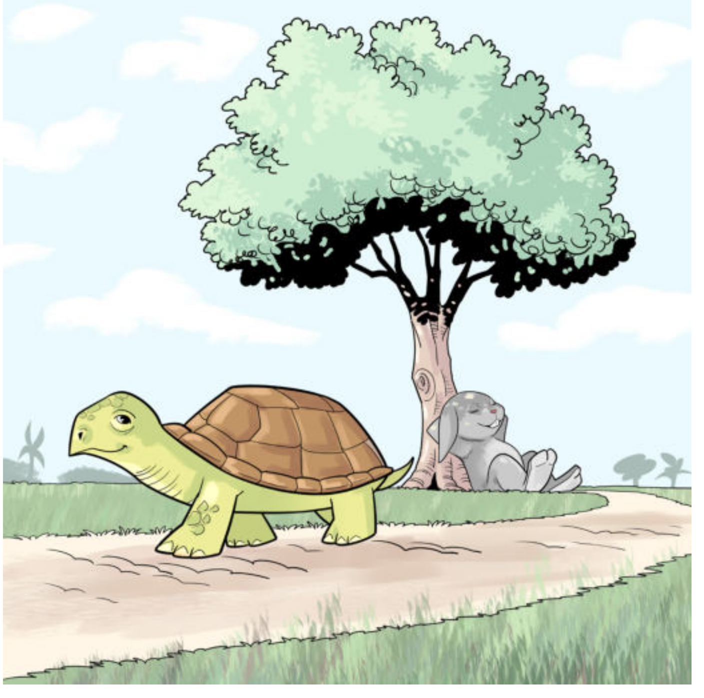

✎ তোমরা ছোটোবেলায় কচ্ছপ ও খরগোশের দৌড় প্রতিযোগিতার গল্পটা শুনে থাকবে। যেখানে খরগোশ দৌড়ে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়ার পরেও আলসেমি করে ঘুমিয়ে পরে আর অন্যদিকে কচ্ছপ ধীর স্থিরভাবে অবিরাম চলে বিজয়ী হয়। চলো আমরা এরকম একটি কাল্পনিক গল্প গতির সমীকরণ ব্যবহার করে সমাধান করি।

✎ একটি কচ্ছপ ও একটি খরগোশ 3Km দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। খরগোশ *0.07* ms^{-1} আদিবেগে এবং 0.002 ms^{-2} ত্বরণে দৌড় শুরু করে। অন্যদিকে কচ্ছপ *0.25* ms^{-1} গড়বেগ নিয়ে দৌড় শুরু করে। প্রতিযোগিতা শুরুর পর খরগোশ 1 ঘণ্টা দৌড়ায়। তারপর অলস খরগোশ 4 ঘণ্টা ঘুমায় এই ভেবে যে, কচ্ছপ অনেক পিছিয়ে আছে তাকে দেখা গেলে সে এক দৌড়ে ফিনিশ লাইন অতিক্রম করবে। খরগোশ ঘুম থেকে উঠে কচ্ছপকে না দেখতে পেয়ে পুনরায় একই আদিবেগ এবং ত্বরণ নিয়ে দৌড়ানো শুরু করে।

✎ প্রশ্ন হলো, 1 ঘণ্টা পর খরগোশটি কচ্ছপ থেকে কতটুকু এগিয়ে থাকবে? এবং দৌড় প্রতিযোগিতায় কে জিতবে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

খেয়াল করে দেখো, আগের দুই সমীকরণে t রাশিটি অর্থাৎ সময় আছে। যদি সময় পরিমাপ করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে t বিহীন গতির সমীকরণ কী হবে তা অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ে 'গতির তৃতীয় সমীকরণে' দেখে নাও। যে গাণিতিক উদাহরণটি দেওয়া আছে তা খাতায় সমাধানের চেষ্টা করো।

নিচের গাণিতিক সমস্যাটি পাশের সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করে সমধান করো।

একজন ট্রাক চালক $60\ km h^{-1}$ বেগে ট্রাক চালাচ্ছিলেন। 50m দূরে একজন পথচারীকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক চাপ দিলেন। এতে ট্রাকটি পথচারীর মাত্র 2m সামনে এসে থেমে গেল। ট্রাকটির ত্বরণ (মন্দন) কত?

অষ্টম সেশন

- সাধারণভাবে কোনো কিছু করাকে কাজ বললেও পদার্থবিজ্ঞানে 'কাজ' শব্দটার ভিন্ন মানে আছে। যেমন ধরো, তুমি এখন এই বইটি পড়ছো, এটাকে সাধারণভাবে কাজ বললেও পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় এটাকে কাজ বলা যাবে না। তাহলে কাজ শব্দটির সুনির্দিষ্ট অর্থ কী তা একটু ভালোভাবে জেনে নেওয়া দরকার। অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে 'কাজ ও শক্তি' অংশটি ভালো করে পড়ে নাও।

- এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, কেন বই পড়া কিংবা টিভি দেখাকে কাজ বলা যাবে না। তবে খাতায় যখন তুমি কলম বা পেন্সিল চালিয়ে লেখ তখন সত্যিকার অর্থে কাজ হয়। তুমি হাত দিয়ে বল প্রয়োগ করো এবং তোমার বল প্রয়োগে করার ফলে কলম সরে সরে যায়, মানে কাজ হয়।

- কিংবা তুমি যখন ফুলবল খেলার সময় বলে লাথি মারো তখন বলটির সরণ হয়, এটাও একটা কাজ। কাজের পরিমাণ হিসাব করার জন্য একটি সূত্র তোমরা জেনেছ, $W= F \times s$ অর্থাৎ দুজন ব্যক্তির মধ্যে কে বেশি কাজ করছে কে কম কাজ করছে তা নির্ভর করছে বল ও সরণের গুণফলের উপর।

- কাজ কী সবই সমান করতে পারে কিংবা কাজের সামর্থ্য কী সবার সমান হয়? কাজ করতে প্রয়োজন শক্তির। তুমি যে লেখার সময় হাত দিয়ে বল প্রয়োগ করেছ তখন নিশ্চয়ই তোমার হাতটা নিজে নিজে বল প্রয়োগ করেনি। এই শক্তি এলো কোথা থেকে? এই শক্তি এসেছে তুমি সকালে যে নাস্তা করেছ সেই খাবারের রাসায়নিক শক্তির থেকে। সেটি কোষের মাইটোকন্ড্রিয়া তাপ শক্তিতে রূপান্তর করেছে। বিষয়টি ভালো করে জেনে নিতে অনুসন্ধানী পাঠের 'শক্তির ক্রম রূপান্তর' অংশটুকু পাশের সহপাঠীকে সঙ্গে নিয়ে পড়ে নাও।

- সপ্তম শ্রেণির 'হরেক রকম খেলনার মেলা' অভিজ্ঞতাটার কথা মনে আছে? সেখানে তোমরা প্লাস্টিকের বোতলের দুপাশে দুটি কাঠি বেঁধে তার সঙ্গে রাবারব্যান্ড ও চামচ পেঁচিয়ে একটি খেলনা বানিয়েছিলে যেটি পানিতে আপনা আপনি চলেছিল? যখন রাবারব্যান্ডটিকে পেঁচিয়েছিলে তখন সেটা শক্তি হিসেবে ধরে রেখেছিল আর যেই না বোতলটাকে পানিতে ছেড়ে দিয়েছিলে সেই শক্তিটি তখন কাজ করেছিল চামচটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে। এই ধরনের শক্তির সাধারণ নাম 'বিভব শক্তি'।

- অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে 'বিভবশক্তি' অংশটুকু পড়, সেখানে আরও কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে সেটা বুঝার চেষ্টা করো।

- তোমরা জেনেছ কোনো কিছুকে উপরে তোলা হলে তার মাঝে বিভবশক্তি জমা হয়। কতটুকু বিভবশক্তি জমা হয় তা বের করা খুব সহজ। অনুসন্ধানী পাঠে বিভবশক্তির শেষ অংশে খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করা আছে, একটু পড়ে নাও।

- তুমি যখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠো তখন তোমার ওজন ও যতটুকু উপরে উঠেছ তা যদি তুমি গুণ করো তাহলে ঐ উচ্চতায় তোমার বিভব শক্তির পরিমাণ পেয়ে যাবে।

✎ চলো একটা পরীক্ষা করে দেখা যাক উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভব শক্তি বাড়ে কি না। একটা স্প্রিং ব্যালেন্সের সাহায্যে হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন কোনো একটি বস্তু যেমন হতে পারে, ইটের টুকরো, পানির বোতলের ওজন বের করে নাও। এবার বস্তুটিকে বিভিন্ন উচ্চতায় রেখে বিভবশক্তির হিসাব করে নিচের ছকে লিখ। যদি স্প্রিং ব্যালেন্স না পাও তাহলে নির্দিষ্ট ভরের বাটখারা ব্যবহার করতে পারো। আর ইতোমধ্যে তোমরা জেনে গেছো ভরের সঙ্গে অভিকর্ষজ ত্বরণ $g=9.8\ ms^{-2}$ গুণ করলেই বস্তুর ওজন পাওয়া যায়।

বস্তুটির ওজন $W=mg$ (N)	উচ্চতা h (m)	বিভব শক্তি $E=mgh$

- বস্তুর ভরের যদি কোনো পরিবর্তন না হয় তাহলে ওজনেরও পরিবর্তন হবে না। ফলে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর বিভব শক্তি বাড়তে থাকবে।

নবম সেশন

- গত সেশনে একটা বস্তুর বিভব শক্তি নির্ণয়ের সময় বস্তুকে উপরে তুলেছিলে। এখন যদি বস্তুটিকে নিচের দিকে পড়তে দেওয়া হয় তাহলে কী হবে? বুঝতেই পারছো সেটি যত উপর থেকে পড়বে ভূমিতে এসে ততজোরে আছড়ে পড়বে।

- একটা পরীক্ষণ করেই দেখো না, এক বালতি পানি নাও। এবার এক টুকরো ইট অথবা পাথর ১ ফুট, ২ ফুট, ৩ ফুট, ৪ ফুট, ৫ ফুট এভাবে বিভিন্ন উচ্চতা থেকে ফেলে দিয়ে দেখো। কোনক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পানি ছিটকে পড়ে?

- তোমার মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন এসেছে উপরে তুললে তো বিভব শক্তি জমা হয় সেটি কীভাবে নিচের দিকে পানি ছিটকিয়ে ফেলছে? এবার চলো তাহলে গতিশক্তি কীভাবে পরিমাণ করে তা জেনে নিয়ে এর উত্তরটা খুঁজি।

- অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে 'গতিশক্তি' অংশটুকু ভালোভাবে পড়ে পাশের সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করে নাও। কোনো প্রশ্ন থাকলে শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করে ধারণা স্পষ্ট করে নাও।

- এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো $W=mgh$ পরিমাণ কাজটুকু (বিভব শক্তি) m ভরের ঐ ইট বা পাথরের টুকরোর ভেতর $\frac{1}{2}mv^2$ পরিমাণ গতিশক্তি সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ কাজ করা হলে সেটি নষ্ট হয় না, সেটি শক্তি সৃষ্টি করে।

- তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ গতিশক্তি বেগের বর্গের উপর নির্ভর, অর্থাৎ বেগ যদি দ্বিগুণ হয়ে যাত তাহলে গতিশক্তি বেড়ে যায় চারগুণ। এজন্য বেশি বেগে যানবাহন চালালে বিপদের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়।

- অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ে একটি উদাহরণ দেওয়া আছে সেটাতে একটু চোখ বুলাও তো। নিজে সমাধান করার চেষ্টা করো।

- শক্তিকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না, এক ধরনের শক্তি কেবল অন্য ধরনের শক্তিতে বদলাতে পারে। এটাকে বলে শক্তির নিত্যতা। তুমি যে পাথরটির সর্বোচ্চ উচ্চতায় বিভবশক্তি নির্ণয় করেছিলে, সেটিকে যখন নিচের দিকে পড়তে দিয়েছ তখন বিভবশক্তি কমতে শুরু করেছে আর গতিশক্তি বাড়তে শুরু করেছে। একবারে ভূমি স্পর্শ করার আগ মুহূর্তে বিভবশক্তি হয়ে গেছে শূন্য আর গতিশক্তি তখন সর্বোচ্চ। অবশ্য কিছু শক্তির অপচয় হয়েছে বাতাসের বাধা এবং ভূমিতে ধাক্কা খেয়ে তাপ ও শব্দ শক্তি হিসেবে। সেইসব শক্তিকে আমরা আপাতত বিবেচনায় আনবো না।

- অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ে জেনেছ শক্তির নিত্যতা অনুযায়ী $mgh = 1/2\ mv^2$ এই তত্ত্ব ব্যবহার করে

তোমার খাতায় নিচের সমস্যাগুলোর গাণিতিক সমাধানের চেষ্টা করো তো।

I. 10 Kg ভরের একটা বস্তুকে $100ms^{-1}$ বেগে উপরের দিকে ছুড়ে দিলে এটা কত উপরে উঠবে?

II. 5 Kg ভরের একটা বস্তুকে $50ms^{-1}$ বেগে উপরের দিকে ছুড়ে দিলে কোন উচ্চতায় এর বিভবশক্তি এবং গতিশক্তি সমান হবে?

III. A বিন্দু থেকে বস্তুটিকে ছেড়ে দিলে এটি কত বেগে ভূপৃষ্ঠকে আঘাত করবে?

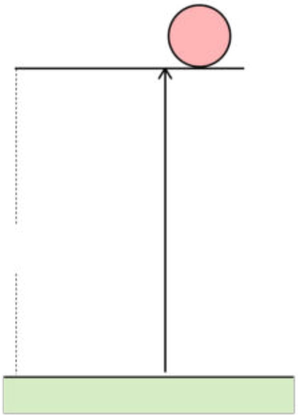

দশম সেশন

- তোমরা পাবনা জেলার রূপপুরের আমাদের দেশের প্রথম নির্মিতব্য নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রের নাম শুনে থাকবে। সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মূল শক্তি আসে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটির সেই বিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$ থেকে। আরেকটু ভালো করে জেনে নিতে অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের 'ভর শক্তির সম্পর্ক' অংশটুকু পড়ে নাও।

- এবার তোমাদের আরেকটি নতুন রাশির সঙ্গে পরিচয় হবে যেটিকে দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকি। তা হলো 'ক্ষমতা'—হ্যাঁ, ক্ষমতা শব্দটা আমরা অনেক সময় নেতিবাচক অর্থেই প্রয়োগ হতে দেখি। তবে ভয় নেই পদার্থবিজ্ঞানে ক্ষমতা শব্দটিরও সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে, ক্ষমতা হচ্ছে কাজ করার হার। অর্থাৎ প্রতি একক সময়ে একটা বস্তু অথবা যন্ত্র কতটুকু কাজ করল তা হচ্ছে ক্ষমতা।

- তোমাদের শ্রেণিতে আজকের দিনের জন্য সবচেয়ে 'ক্ষমতাবান' (পদার্থবিজ্ঞানের চোখে) কে তা কি হিসাব করতে চাও? তার আগে ক্ষমতা কীভাবে পরিমাপ করে জেনে নাও অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে।

- এবার চলো 'একদিনের জন্য সবচেয়ে ক্ষমতাবান শিক্ষার্থী' খুঁজে বের করা যাক।

- তোমাদের স্কুলের ভবনের অথবা একটা দালানের দুই অথবা তিনতলার মোট কতগুলো সিঁড়ি গুণে নাও এবার সিঁড়ির উচ্চতাকে গুণ করে ভবনের নিচ থেকে দুই বা তিনতলার উচ্চতা বের করো।

- একটি ওজন মাপার যন্ত্রে তোমার ভর মাপ।

- তুমি যত দ্রুত সম্ভব সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠো, ঘড়ি ব্যবহার করে কতটুকু সময় লেগেছে তা মেপে নাও। একইভাবে তোমাদের শ্রেণির অন্যান্য শিক্ষার্থীদের ভর ও সময়ের তথ্য নিচের ছকে রেকর্ড করো। তোমার শ্রেণিতে এমন কেউ যে উপরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারবে না তার ক্ষেত্রে ওজনটা

মেপে সময়ের একটা গড় মান ধরে নাও।

এবার নিচের ছক ব্যবহার করে তোমার এবং তোমার বন্ধুদের শারীরিক ক্ষমতা বের করো এবং সবচেয়ে ক্ষমতাবান শিক্ষার্থীকে তাকে খুঁজে বের করো।

ছাদের উচ্চতা h= মোট সিঁড়ির সংখ্যা × সিঁড়ির উচ্চতা h= ______________ (m)

শিক্ষার্থীর নাম	ভর (m) Kg	ছাদে উঠার সময় (t) s	কাজ W=mgh (J)	ক্ষমতা P=W/t (W)

ফিরে দেখা

গতির সমীকরণ কাজে লাগিয়ে তুমি দৈনন্দিন কী ধরণের সমস্যার সমাধান করতে পারো?

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

নিউটনের গতিসূত্র কাজে লাগিয়ে তুমি কী বলতে পারবে কোন যানবাহনে দুর্ঘটনার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি? যুক্তি দাও।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

আমাদের ল্যাবরেটরি

বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে কত কিছু থাকে দেখেছ? কেমন হতো যদি তোমাদের নিজেদের এরকম একটা গবেষণাগার থাকত যেখানে নানা ধরনের উপকরণ দিয়ে তোমরা সত্যিকারের বিজ্ঞানীদের মতো সব এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারতে? এই অভিজ্ঞতায় তোমাদের ক্লাসরুমকেই কীভাবে একটা গবেষণাগার হিসেবে গড়ে তোলা যায় চলো দেখা যাক! নিশ্চয়ই ভাবছ, ল্যাবরেটরি বানাতে কত কিছু লাগে, এত কিছু পাওয়া যাবে কী করে? সত্যি বলতে, আমাদের বাসাবাড়িতে বা প্রাত্যহিক প্রয়োজনে আমরা যা যা ব্যবহার করি তার মধ্য থেকেই বেছে নেয়া যাবে আমাদের ল্যাবরেটরির দরকারি সব উপকরণ। চলো শুরু করা যাক!

প্রথম সেশন

- বিজ্ঞানের গবেষণা মানেই বড়ো বড়ো গবেষণাগার, সেখানে অ্যাপ্রন পরে সব বিজ্ঞানী ছোটাছুটি করছে এমন একটা ছবিই তো মনে ভেসে ওঠে, তাই না? কিন্তু দামি দামি যন্ত্রপাতি আর বিশাল ল্যাবরেটরি ছাড়া কি বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্ভব নয়? ইতোমধ্যেই তোমরা জানো, আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য উপকরণ দিয়েই দারুণ সব পরীক্ষণ করা সম্ভব। উপরের ক্লাসে উঠে তোমরা পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন আর জীববিজ্ঞানের অনেক জটিল জটিল পরীক্ষণ হয়তো করবে, সত্যিকারের বড়ো গবেষণাগারে কাজের অভিজ্ঞতাও হয়তো অনেকেরই হবে। এই মুহূর্তে যেহেতু সেটা সম্ভব নয়, আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের সুলভ উপকরণ জোগাড় করেই একটা ক্ষুদে গবেষণাগার তৈরি করলে কেমন হয়? এই শিখন অভিজ্ঞতায় এই কাজটাই তোমরা করবে। আপাতত আমাদের এই ল্যাবে মূলত হবে রসায়নের নানা গবেষণা, সেটি মাথায় রেখেই গবেষণাগার সাজাতে হবে।

- প্রথমেই ভেবে দেখো, একটা ল্যাবরেটরিতে কী কী লাগে? তোমাদের বিজ্ঞান শিক্ষক এ বিষয়ে তোমাদের সাহায্য করতে পারবেন। স্কুলে যদি রসায়নের আরও কোনো শিক্ষক থাকেন তার মতামতও তোমরা নিতে পারো। আর সুযোগ থাকলে কোনো গবেষণাগার পরিদর্শন করেও দেখতে পারো সেখানে কী কী ধরনের সামগ্রী থাকে। আপাতত তোমাদের গবেষণাগারের জন্য আস্ত একটা কক্ষ দরকার নেই, বরং একটা পুরোনো বড়োসড়ো কার্টন পেলে তার মধ্যেই তোমাদের সকল সামগ্রী গুছিয়ে রাখতে পারবে।

- ছোটো ছোটো দলে বসে আলোচনা করে দেখো, কী কী ধরনের সামগ্রী প্রয়োজন হতে পারে। নিচে কয়েক ধরনের সামগ্রী নমুনা হিসেবে দেয়া হলো, এর বাইরেও আর কী কী হতে পারে তোমরা ভেবে দেখো।

    - পরীক্ষণের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি (বিভিন্ন ধরনের পাত্র, পরিমাপের যন্ত্র ইত্যাদি)
    - রাসায়নিক উপকরণ
    - কাজের রেকর্ড রাখার জন্য ল্যাবরেটরি নোটবুক
    - নিরাপত্তার জন্য ফার্স্ট এইড
    - পরিষ্কার করার জিনিসপত্র

- তোমার দলের সঙ্গে আলোচনা হয়ে গেলে পরে এই বিভিন্ন ক্যাটাগরি বা ধরন অনুযায়ী কী কী জিনিস লাগতে পারে তার একটা তালিকা তৈরি করে নাও। আবারও নিচে একটা নমুনা তালিকা দেয়া হলো, তবে এটি শুধুই নমুনামাত্র। তোমরাই ভেবে দেখো, কী কী লাগতে পারে তোমাদের এই গবেষণাগারে।

উপকরণের ধরন	উপকরণের নমুনা তালিকা
পরীক্ষণের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি	☑ বিভিন্ন আকারের পাত্র ☑ পরিমাপের যন্ত্র ও উপকরণ (স্কেল বা রুলার, ছোটো বাটখারা ও দাঁড়িপাল্লা, স্টপওয়াচ, থার্মোমিটার ইত্যাদি) ☑ মোমবাতি/স্পিরিট ল্যাম্প ☑ চামচ, চিমটা ☑ বিভিন্ন আকারের কন্টেইনার (ব্যবহৃত পুরোনো পানির বোতল, বিভিন্ন আকারের পুরোনো কৌটা, খালি আচারের বৈয়াম ইত্যাদি) ☑ বিভিন্ন উপকরণের কন্টেইনার লেবেল করার জন্য কাগজ, আঠা, স্কচটেপ, কলম, মার্কার ইত্যাদি
রাসায়নিক উপকরণ	নির্ভর করছে তোমরা কী কী পরীক্ষণ করবে তার ওপরে। এই শিখন অভিজ্ঞতায় যেসব রাসায়নিক উপকরণ প্রয়োজন হবে তা যথাসময়ে জোগাড় করে নির্দিষ্ট কন্টেইনারে গুছিয়ে লেবেল করে রাখতে হবে।
নিরাপত্তার জন্য ফার্স্ট এইড	অ্যান্টিসেপটিক মলম, তুলা, কাঁচি, গজ, ব্যান্ড এইড, বার্নল, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইত্যাদি
পরিষ্কার করার জিনিসপত্র	একাধিক ন্যাকড়া
এবং, গবেষণাগারের সকল সামগ্রী গুছিয়ে রাখার জন্য একটা পুরোনো বড়ো কার্টন, তার মধ্যে খোপ খোপ করে বা তাক বানিয়ে বিভিন্ন জিনিস রাখার জন্য ছোটো বড়ো বিভিন্ন সাইজের কার্টন বা বাক্স	

- তোমাদের তালিকা তৈরি? এবার বিভিন্ন দলের তালিকার উপকরণগুলোর নাম শুনে নাও, তোমাদের তালিকাও অন্যদের জানাও। যেহেতু পুরো ক্লাসে একটাই গবেষণাগার তৈরি হবে, সব দলের তালিকা মিলিয়ে আলোচনা করে কী কী লাগবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নাও। উপকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় কিছু বিষয় মাথায় রেখো;

    - ফেলে দেয়া, কিংবা দৈনন্দিন ব্যবহার্য এমন, অতি স্বল্পমূল্যের বা বিনামূল্যের উপকরণ জোগাড় করতে পারলে সবচাইতে ভালো।

    - তালিকার যে উপকরণগুলো বাসাবাড়িতে নিত্য ব্যবহার্য নয় (যেমন— অ্যালকোহল থার্মোমিটার), সেগুলো স্কুলে জোগাড় করা সম্ভব কি না এ নিয়ে শিক্ষকের পরামর্শ নাও।

    - যে উপকরণগুলো বাসাবাড়িতে সুলভ নয়, কিংবা স্কুলেও নেই, সেগুলোর বিকল্প সহজ কী ব্যবহার করা যেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করো।

- পরের সেশনে কোন দল কী কী উপকরণ জোগাড় করবে, আর শিক্ষক কোন কোন উপকরণের দায়িত্ব নেবেন সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও।

- তোমাদের গবেষণাগারের প্রথম পরীক্ষণ হবে পরের সেশনে। সেজন্য প্রয়োজন হবে সামান্য গুঁড়া হলুদ, চুন, আর লেবু। প্রথম দিনের উপকরণ আনার দায়িত্ব শিক্ষক নেবেন, তবে একই উপকরণ ব্যবহার করে এই পরীক্ষণ তোমরা বাড়িতেও করতে পারো।

দ্বিতীয় সেশন

- গত সেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব দল তাদের নির্ধারিত উপকরণগুলো নিয়ে এসেছে? এবার তাহলে শিক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী সেগুলো কার্টন বা বাক্সে গুছিয়ে রাখো। স্কুলে তোমাদের অবর্তমানে এই ছোট্ট গবেষণাগার ঠিকভাবে দেখে রাখার দায়িত্ব তোমাদের শিক্ষক নিতে পারেন।

- তোমরা চাইলেই দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য জিনসপত্র ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে পারো। চলো তাহলে এরকম কয়েকটা পরীক্ষণ করে দেখা যাক।

- বাড়ি থেকে আনা জিনিসগুলো প্রথমে কার্টুনের বিভিন্ন তাকে সাজিয়ে রাখো।

- একটি গ্লাসের/পানির বোতলের অর্ধেক পানি দিয়ে পূর্ণ করে তাতে চা চামচের অর্ধেক পরিমাণ গুঁড়া হলুদ নিয়ে ভালো করে নাড়াও। দেখবে পানির রং সরষে হলুদ হয়ে গেছে।

- এবার এই দ্রবণে সামান্য চুন গুলিয়ে তা ভালো করে নাড়ো। দেখো তো কী হয়? হলুদ রংটা পাল্টে লাল রং হয়ে গেল, তাই না? খুব অবাক হচ্ছো?

- কোনোভাবে কী আবার হলুদ রং ফেরত আনা যাবে বলে মনে হয়? চলো চেষ্টা করে দেখা যাক।

- ঐ দ্রবণে এবার একটি লেবু কেটে চিপে ফোঁটায় ফোঁটায় রস যোগ করো। দেখো তো ধীরে ধীরে হলুদ রং ফিরে আসছে কি?

- হ্যাঁ, আবার দ্রবণের রং হলুদ হয়ে গেছে।

- এরকম আরও পরিবর্তন আমরা হরহামেশাই দেখি। যেমন— লেবু চা বানানোর জন্য যখন চায়ের লিকারে লেবুর রস যোগ করা হয় তখন চায়ের রং কীভাবে পালটে যায় খেয়াল করেছ? চাইলে শ্রেণিকক্ষে এই কাজটি করে রঙের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পারো।

- এই সবকিছুই আসলে এক ধরনের পরিবর্তন। উপরের পরীক্ষণ দুটিতে কোন ধরনের পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তা যুক্তিসহ নিচের ছক-১ এ লিখে রাখো। কোনো কোনো পরিবর্তনে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয় না। শুধু পদার্থের ভৌত অবস্থার পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনগুলো ভৌত পরিবর্তন। কোনো কোনো পরিবর্তনে ভিন্ন বর্ণের ও ধর্মের নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই পরিবর্তনগুলো রাসায়নিক পরিবর্তন।

- ছক-১ পরিবর্তন শনাক্তকরণ ও তার পক্ষে যুক্তি

পরীক্ষণ	পরিবর্তনের নাম এবং এর পক্ষে যুক্তি
হলুদ, চুন ও লেবুর রসের পরীক্ষণ	
লেবুর রস যোগ করায় চায়ের লিকারের রঙের পরীক্ষণ	

- সেশন শেষ করার পূর্বে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণগুলো কার্টুনের বিভিন্ন তাকে সাজিয়ে রাখো।

তৃতীয় থেকে অষ্টম সেশন

- রাসায়নিক পরিবর্তন হয় রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে। কোনো নির্দিষ্ট পদার্থ কেন অন্য কোনো পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তা বুঝতে হলে আগে পদার্থের গঠন খুব ভালো করে বুঝে নেয়া জরুরি।

- তোমরা ইতোমধ্যেই জানো, মৌলিক পদার্থের পরমাণু গঠিত হয় ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা। পরমাণুতে এই তিন ধরনের কণা কীভাবে বিন্যস্ত থাকে তা জেনে নেয়া জরুরি। কেন কোনো নির্দিষ্ট পদার্থ অন্য পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে তা বুঝতে হলে এই বিন্যাস জানা দরকার। শিক্ষকের সহায়তায় তোমাদের অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের ‘পরমাণুর গঠন’ অধ্যায় থেকে পরমাণুর গঠন, ইলেকট্রন বিন্যাসের নিয়ম, রাসায়নিক সংকেত নির্ণয়, আইসোটোপ, মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা ও ভরসংখ্যা, ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নাও। এই শিখন অভিজ্ঞতায় তোমরা যে রসায়নের পরীক্ষণগুলো করবে সেগুলো ব্যাখ্যা করতে এই বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন হবে।

- এখন যে কোনো পদার্থের ইলেকট্রন সংখ্যা জানলে নিশ্চয়ই তোমরা তার শক্তিস্তরে ইলেকট্রন বিন্যাস বের করতে পারবে? একটু ঝালাই করে নেবার জন্য নিচের মৌলগুলোর ইলেকট্রন বিন্যাস এঁকে দেখাও তো—

মৌলের নাম ও প্রতীক	পারমাণবিক সংখ্যা	ইলেকট্রন বিন্যাস
ফ্লোরিন (F)	৯	
পটাশিয়াম (K)	১৯	

মৌলের নাম ও প্রতীক	পারমাণবিক সংখ্যা	ইলেকট্রন বিন্যাস
ক্রোমিয়াম (Cr)	২৪	
কপার (Cu)	২৯	

নবম সেশন

আগের সেশনগুলোর আলোচনা থেকে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে, সর্বশেষ শক্তিস্তরের ইলেকট্রন বিন্যাসের উপর নির্ভর করে কোনো মৌল অন্য কোনো মৌলের সঙ্গে কীভাবে ইলেকট্রন বিনিময় বা শেয়ারের মাধ্যমে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেবে। ইতঃপূর্বে তোমরা প্রতীক ও সংকেত সম্পর্কে ধারণা পেয়েছ। তারপরেও একটু ঝালাই করে নিতে অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের 'রাসায়নিক বিক্রিয়া' অধ্যায় থেকে 'প্রতীক, সংকেত, যোজনী ও আণবিক সংকেত লেখার নিয়ম' অংশটুকু পড়ে নাও। জোড়ায় আলোচনা করে বুঝে নাও।

তাহলে এবার বলো তো, মিথেন অণুর সংকেত CH_4। এদ্বারা যৌগটি কী কী মৌল দিয়ে গঠিত এবং কতটি করে পরমাণু আছে বলতে পারবে? তোমার উত্তর নিচে লিখে রাখো।

মৌলের নাম	মৌলের পরমাণুর সংখ্যা

- যৌগের রাসায়নিক সংকেত লেখার জন্য যোজনী সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা প্রয়োজন। অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে 'যোজনী ও আণবিক সংকেত লেখার নিয়ম' অংশটুকু আরেকবার ভালো করে পড়ে নাও।

- 'অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড' নামের যৌগটি অ্যালুমিনিয়াম এবং অক্সিজেন মৌলের সমন্বয়ে গঠিত। নিচের ফ্লো-চার্ট ব্যবহার করে এই যৌগের সংকেত কী হবে তা বের করো।

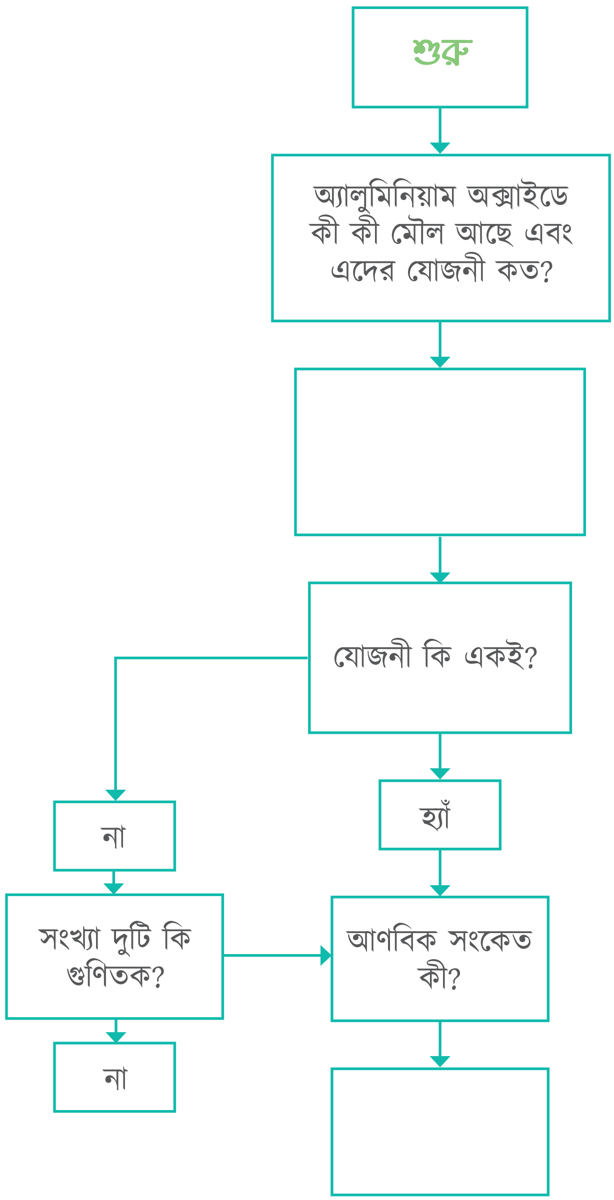

দশম ও একাদশ সেশন

- যোজনী থেকে যৌগের আণবিক সংকেত তো জানা হলো। এবার চলো জেনে নেওয়া যাক রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ ও বিক্রিয়া সম্পর্কে।

- তোমাকে যদি কেউ চ্যালেঞ্জ দেয় মুখ অথবা কোনো যন্ত্র ব্যবহার না করে বেলুন ফুলাতে। তাহলে তুমি কি সেই চ্যালেঞ্জ নিতে পারবে? তবে তুমি এখন যে পরীক্ষণ করতে যাচ্ছো তা যদি তুমি জেনে নাও তাহলে নিশ্চয়ই এই চ্যালেঞ্জ নিতে পারবে।

- একটা আধা লিটার পানির বোতলে ১ কাপ পরিমাণ ভিনেগার নাও। এখন যে বেলুনটাকে তুমি ফোলাতে চাও তার মধ্যে দু-তিন চামচ বেকিং সোডা নিয়ে এমনভাবে বোতলের মুখে আটকে নাও যাতে বেকিং সোডাগুলো ভিনেগারে মিশে না যায়।

- বেলুনটিকে বোতলের মুখে ভালভাবে আটকে নাও। এবার সাবধানে বেলুনটিকে উল্টে দিয়ে বেকিং সোডা পাউডার বোতলে ছেড়ে দাও। ব্যস, এবার দেখো কী হয়!

- নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছো, ভিনেগারের মধ্যে বেকিং সোডা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদবুদ ওঠা শুরু হয়েছে। আর বেলুনটাও আপনা-আপনি ফুলে উঠছে।

- তুমি কি অনুমান করে বলতে পারবে এখানে কী হচ্ছে? বেলুনে পর্যাপ্ত বাতাস প্রবেশ করলে সেটিকে বোতল থেকে সাবধানে খুলে নিয়ে মুখে গিঁট বেঁধে দাও। তুমি কি বলতে পারবে কী দিয়ে বেলুনটি ফুলে উঠেছে? এজন্য তোমাকে রাসায়নিক বিক্রিয়া ও বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হবে। তুমি যে কাজটি করলে সেটি একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং এই বিক্রিয়ার সমীকরণটি হলো—

$$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CO_2 + H_2O + CH_3COONa$$

- এখানে $NaHCO_3$ (বেকিং সোডা) এবং CH_3COOH (ভিনেগার) বিক্রিয়া করে CO_2 (কার্বন-ডাই-অক্সাইড), H_2O (পানি) এবং CH_3COONa (সোডিয়াম এসিটেড) নামের তিনটি নতুন যৌগ তৈরি করেছে। এর মধ্যে CO_2 (কার্বন-ডাই-অক্সাইড) গ্যাস তোমার বেলুনটিকে ফুলিয়ে তুলেছে।

- তুমি চাইলে একটা মোমবাতিতে আগুন জ্বালিয়ে সাবধানে বেলুনের বাতাস আগুনের সামনে ধরতে পারো। দেখো তো কী হয়?

- এখন চলো জেনে নেই রাসায়নিক বিক্রিয়া লেখার নিয়ম। অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে 'রাসায়নিক সমীকরণ ও সমতাকরণ' অংশটুকু ভালো করে পড়ে নাও। কোনো প্রশ্ন থাকলে শিক্ষককে করে ধারণা স্পষ্ট করে নাও।

- এবার নিচের সমীকরণগুলোর সমতা করার চেষ্টা করো তো—

$$___\ N_2 + ____\ H_2 = ____\ NH_3$$

$____ H_2O = _____ H_2 + _____ O_2$

$____ CH_4 + ____ O_2 = _____ CO_2 + ____ H_2O$

$_____ CO_2 = ____ CO + _____ O_2$

$_____ CH_2O + _____ H_2 = ______ CH_3OH$

দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ সেশন

✎ রাসায়নিক বিক্রিয়া লেখা তো জানলে। এবার তাহলে চলো বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। তার আগে চলো আরেকটা মজার কাজ করে আসি।

☑ একটা পাত্রে খানিকটা লেবু অথবা পেঁয়াজ চিপে রস বের করে নাও। এক চা চামচ পরিমাণ রস হলেই চলবে।

☑ এবার একটি কাঠির মাথায় তুলা অথবা কাপড় পেঁচিয়ে অথবা কটন বাড ব্যবহার করে রস দিয়ে সাদা কাগজে কিছু একটা লিখ। চাইলে এই অভিজ্ঞতার শিরোনাম অথবা তোমার নিজের নাম লিখতে পারো।

☑ শুকানোর জন্য কিছুক্ষণ রেখে দাও। কোনো বন্ধুকে সাদা কাগজে কী লেখা আছে জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিতে পারবে না কারণ রসটা শুকিয়ে সাদা কাগজের সঙ্গে মিশে গেছে।

☑ মোমবাতি জ্বালিয়ে অথবা কোনো আগুনের উপর ধরে কাগজটা এবার সাবধানে একটু তাপ দিয়ে দেখো (যেন পুড়ে না যায়)। দেখবে লেখাটা ধীরে ধীরে গাঢ় খয়েরি রং ধারণ করছে ও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

☑ এভাবে তুমি অদৃশ্য কালি তৈরি করে গোপন বার্তাও পাঠাতে পারো! যার সবকিছুর পেছনে রয়েছে রসায়ন। তাহলে চলো এবার অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

✎ অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে সংযোজন, দহন, প্রতিস্থাপন ও বিয়োজন বিক্রিয়া অংশটুকু পড়ে আগে জেনে নাও এই বিক্রিয়াগুলো কীভাবে হয়।

✎ এই বিক্রিয়াগুলোর পরীক্ষা করে দেখতে হলে কী কী উপকরণ লাগবে তা শিক্ষকের সহায়তায় জেনে নাও।

✎ এবার শিক্ষকের সহায়তায় অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ে এই চার ধরনের বিক্রিয়ার যে পরীক্ষণ নির্দেশনা দেওয়া আছে সম্ভব হলে সেগুলোর সবকটি একটি একটি করে সম্পন্ন করো।

পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ সেশন

- রাসায়নিক বিক্রিয়ার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হচ্ছে শক্তির রূপান্তর। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর করে। বিভিন্ন প্রাণী ও আমরা খাবারের মাধ্যমে রাসায়নিক শক্তি গ্রহণ করি যা আমাদের শরীরে অন্য শক্তির জোগান দেয়। এভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে নিহিত শক্তি থেকে শুরু করে জীবাশ্ম জ্বালানির শক্তি এ সবকিছু রাসায়নিক শক্তি। চলো রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে কয়েক রকমের শক্তির রূপান্তর নিয়ে কিছু পরীক্ষণ করা যাক।

- রাসায়নিক শক্তি থেকে তাপশক্তির রূপান্তরের জন্য তোমরা একটা টেস্টটিউব অথবা কাচের গ্লাসে এক চামচ চুন নাও। এবার এতে আধাকাপ পরিমাণ ভিনেগার অথবা লেবুর রস যোগ করে দেখো তো কী হয়?

- তুমি টেস্টটিউব বা গ্লাসের তলদেশ স্পর্শ করে দেখো ঠান্ডা লাগছে নাকি গরম লাগছে?

- অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তির রূপান্তর অংশ পড়ে তোমার ধারণা আরেকটু স্পষ্ট করে নাও এবার।

- রাসায়নিক শক্তি থেকে অন্য আরও কয়েকটি শক্তির রূপান্তর নিয়ে এবার আরেকটা পরীক্ষণ করা যাক।

- এর জন্য তোমার চাই ৪ থেকে ৬টি লেবু, দস্তা বা জিংক দণ্ড (ঢেউটিনে দস্তার প্রলেপ থাকে, কিছুটা ঢেউটিনের অংশ কেটে নিলেও চলবে), তামার দণ্ড (বৈদ্যুতিক তারের ভেতরে যেগুলো পেন্সিলের নিবের মতো মোটা), খানিকটা বিদ্যুৎ পরিবাহী তার, একটা এলইডি বাল্ব (লাইট)।

- এখন প্রত্যেকটা লেবুর দু প্রান্তে একটি করে তামার দণ্ড ও একটি করে দস্তা বা জিংকের দণ্ড প্রবেশ

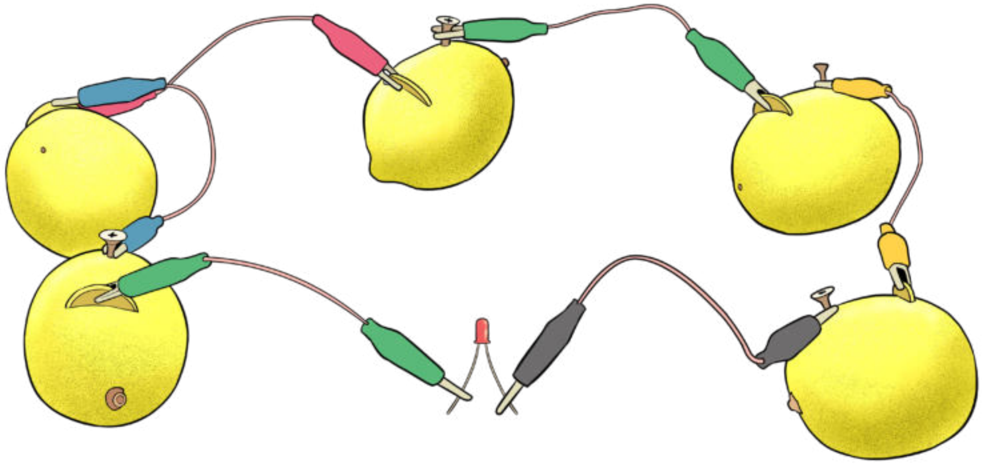

করিয়ে নাও। পরিবাহী তার ব্যবহার করে একটি লেবুর তামার দণ্ডের সঙ্গে আরেকটি লেবুর জিংক দণ্ড সংযোগ করে বর্তনী সম্পন্ন করো। ১ম লেবুর তামার অংশ ঋণাত্মক এবং ৪র্থ লেবুর জিংক অংশ ধনাত্মক প্রান্ত হিসেবে কাজ করবে। এবার একটি এলইডি লাইটের খাটো প্রান্ত লেবুর বর্তনীর ঋণাত্মক প্রান্তে এবং লম্বা প্রান্ত ধনাত্মক প্রান্তে যোগ করে দেখো কী হয়!

✎ নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছো, এলইডি লাইটটি জ্বলে উঠেছে! তুমি রাসায়নিক শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করেছ যেটা এলইডি লাইটকে জ্বালিয়ে আলোক ও কিছুটা তাপশক্তিও তৈরি করছে!

✎ এই পরীক্ষণে ব্যবহৃত ধাতব দণ্ড, সংঘটিত বিক্রিয়ার সঙ্গে অনুসন্ধান পাঠ বইয়ের লবণের (সোডিয়াম ক্লোরাইড) তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত ধাতব দণ্ড, সংঘটিত বিক্রিয়ার তুলনা করো। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিচে লিখে রাখো।

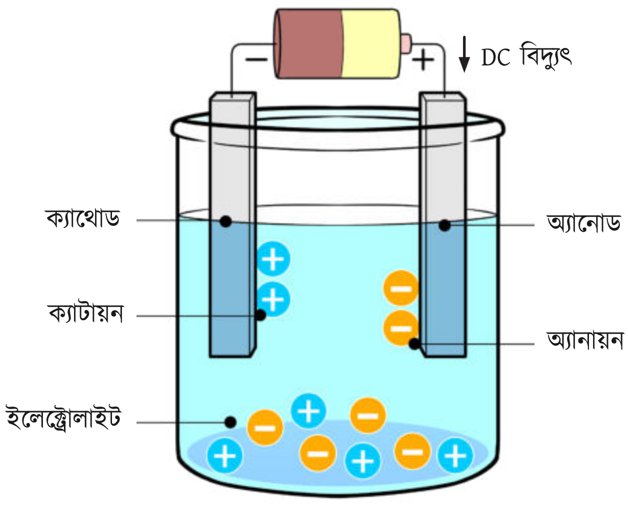

ইলেকট্রোলাইসিস প্রক্রিয়া

পরীক্ষণে ব্যবহৃত ধাতব দণ্ড, সংঘটিত বিক্রিয়া	তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত ধাতব দণ্ড, সংঘটিত বিক্রিয়া

✎ এবার অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে শুষ্ক কোষ ব্যবহার করে রাসায়নিক শক্তি থেকে আলোকশক্তিতে রূপান্তর অংশটুকু পড়ে বলো তো এখানে তামা ও জিংকের (দস্তা) দণ্ডের মধ্যে কোনটি অ্যানোড আর কোনটি ক্যাথোড হিসেবে কাজ করছে? তা যুক্তি সহকারে লিখে রাখো।

ধাতব দণ্ড	অ্যানোড/ক্যাথোড চিহ্নিত করে তার পক্ষে যুক্তি
কপার (তামা) দণ্ড	
জিঙ্ক (দস্তা) দণ্ড	

- হাতের কাছে কোনো নষ্ট ব্যাটারি সেল থাকলে সেটা খুলে ভেতরের অংশগুলো খুঁটিয়ে দেখতে পারো।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ সেশন

- আমাদের নিত্যদিনের জীবনে অম্ল বা অ্যাসিড এবং ক্ষারক অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করে থাকি। তবে অনেক সময় আমরা জানি না কোনটা অম্ল আর কোনটা ক্ষারক। খুব সহজেই কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এবং নির্দেশক ব্যবহার করে এ দুটিকে আলাদা করা যায়। তার আগে,
- এই সেশন শুরুর পূর্বেই শিক্ষকের নির্দেশে তোমরা নিচের উপকরণগুলো বাড়ি থেকে আনবে।
- ১টি করে- লেবু ও তেঁতুল। ১ চা চামচ পরিমাণ- লবণ, চুন, ডিটারজেন্ট সাবান। ২ টেবিল চামচ পরিমাণ- ভিনেগার।
- এছাড়াও শিক্ষক তোমাদেরকে আরও কিছু রাসায়নিক পদার্থ দিয়েছেন। এগুলো টেস্টটিউব অথবা অন্য কোনো পাত্রে নিয়ে পাত্রের গায়ে নাম লিখে নাও।
- কোনটা অম্ল আর কোনটা ক্ষার তা কী দেখে বুঝা যাচ্ছে? তাহলে চলো আমরা লিটমাস পেপার

পরীক্ষা করে দেখে নেই কোনটা অম্ল আর কোনটা ক্ষারক। কিন্তু তার আগে, অম্ল ও ক্ষারক কী, এদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য কী তা জেনে নেওয়া যাক।

✎ লিটমাস পেপার কী সেই প্রশ্ন নিশ্চয়ই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে? সাধারণ কাগজে যখন লাইকেন (lichen) নামক এক ধরনের গাছ থেকে প্রাপ্ত রং মিশানো হয়, তখন লিটমাস পেপার তৈরি হয়। কোন দ্রবণ অ্যাসিডিক না ক্ষারীয় তা পরীক্ষা করতে লিটমাস পেপার ব্যবহার করা হয়। অম্লীয় বা অ্যাসিডিক দ্রবণ নীল লিটমাস পেপারকে লাল করে এবং ক্ষারীয় দ্রবণ লাল লিটমাস পেপারকে নীল করে। তোমাদের অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ে একটা চিত্র দেওয়া আছে সেটি দেখে নাও। এই লিটমাস পেপার এক ধরনের নির্দেশক। নির্দেশক হচ্ছে, এমন সব পদার্থ যাদের নিজেদের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো একটি বস্তু অম্ল না ক্ষার বা কোনোটিই নয়, তা নির্দেশ করে।

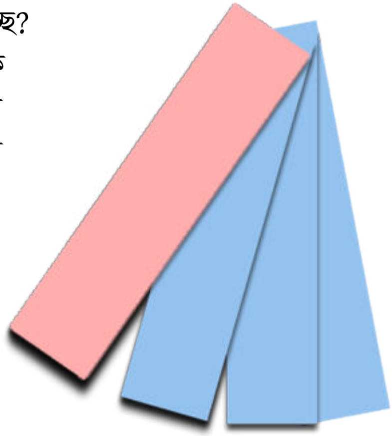

✎ তোমাদের অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে অম্ল ও ক্ষারক অংশটুকু পড়া নাও।

✎ পড়া শেষ হলে কয়েকটি টেস্টটিউব অথবা পাত্রে ৫ মিলি পানির মধ্যে তোমাদের আনা বস্তুগুলোকে মিশিয়ে নাও।

✎ তারপর শিক্ষকের দেওয়া লাল ও নীল দুটি লিটমাস পেপার ব্যবহার করে তোমাদের নমুনা বস্তুগুলোকে কোনটি অম্ল ও কোনটি ক্ষারক এর ভিত্তিতে আলাদা করে নিচের ছকে লিখ।

বস্তুর নাম	অম্ল নাকি ক্ষারক	কারণ?

- যদি লিটমাস পেপার না থাকে তাহলেও চিন্তা নেই। ফল ও সবজি থেকে নির্যাস বের করেও নির্দেশক বানানো সম্ভব। আর কিছু না পেলে একটা সাদা কাগজে কিছু লাল ফুল (এমনকি লাল সবজি; যেমন, লাল বাঁধাকপির রসও চাইলে ব্যবহার করতে পারো) ভালো করে ঘষে কাগজটা রঙিন করে নাও। এটিও নির্দেশকের কাজ করবে।

- এবার লবণ-পানির দ্রবণে লিটমাস পেপার অথবা ফলের নির্যাস থেকে বানানো নির্দেশক যোগ করে দেখো তো কোনো পরিবর্তন হয় কি না?

- দেখবে লিটমাস পেপারের রং পরিবর্তন হয়নি। খাবার লবণের মতো আরও অনেক লবণ আছে যারা নিরপেক্ষ পদার্থ অর্থাৎ এরা লিটমাস পেপারের রং পরিবর্তন করতে পারে না।

- তবে তুমি যে লবণটি এনেছ, তাতে আয়োডিন আছে কি না তা কিছু তুমি পরীক্ষা করে দেখতে পারো। এজন্য কিছুটা লবণ নিয়ে তাতে ভাত মেখে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস যোগ করলেই হবে। যদি লবণটা গাঢ় বেগুনি রঙের হয়ে যায় তাহলে বুঝবে পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়োডিন আছে।

- অম্ল ও ক্ষারক তো আলাদা করতে শিখলে, এবার এদের ব্যবহার সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

- অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে অম্ল ও ক্ষারকের ব্যবহার অংশটুকু পড়ে জোড়ায় আলোচনা করে নাও। বইয়ে যা লেখা আছে সেটার সঙ্গে তুমি কী তোমার বা তোমার পরিবারের জীবনে অম্ল-ক্ষারকের ব্যবহারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছো? অর্থাৎ কীভাবে তোমাদের বাসাবাড়িতে এসব ব্যবহার হয়? নিচে লিখে ফেলো—

অম্লের ব্যবহার	ক্ষারকের ব্যবহার	লবণের ব্যবহার

- অম্ল ও ক্ষারকের বেশ কিছু রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য আছে। অম্ল ধাতুকে গলিয়ে দিতে পারে। অনেক শক্তিশালী অম্লের কথা বাদ দিলাম।

- বাসাবাড়িতে ব্যবহার্য সাধারণ অ্যাসিড যেমন ভিনেগার ব্যবহার করে একটা পরীক্ষা নিজের বাসায় করে দেখতে পারো। একটা ডিম নিয়ে ভিনেগারে ডুবিয়ে রাখো টানা দুই দিন। দুদিন পর ডিমটিকে তুলে দেখবে ডিমের শক্ত খোসা গলে কেমনে তুলতুলে হয়ে গেছে!

- এই পরীক্ষায় নিশ্চয়ই বেশ মজা পেয়েছ? তবে বস্তুটা ডিম না হয়ে অন্যকিছু হলে কিন্তু আর অত মজার থাকবে না! জেনে অবাক হবে যে, বাজারে প্রচলিত কোমল পানীয়র মধ্যে ফসফরিক এসিড থাকে যা দাঁত গলিয়ে না দিলেও অতিরিক্ত পান করলে দাঁতের ক্ষতির জন্য যথেষ্ট!

বিংশ সেশন

- নিজেদের গবেষণাগারে অনেক ধরনের পরীক্ষণ তো হলো, নানা ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নতুন নতুন পদার্থ তৈরি হতেও দেখলে। চলো, এবার এমন কোনো পরীক্ষা করে দেখা যাক, যার ফলাফল আমরা দৈনন্দিন জীবনেও কাজে লাগাতে পারি।

- আমাদের নিত্যদিনের জীবনে গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত অন্যতম একটি রাসায়নিক পদার্থ হলো সাবান। অল্প কিছু রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে তোমরা নিজেরাই সাবান তৈরি করতে পারো। চলো তাহলে জেনে নেওয়া যাক সাবান তৈরি করতে কী কী করতে হবে।

  ☑ সাবান তৈরি করার জন্য প্রধান উপাদান হিসেবে প্রয়োজন হয় তেল বা চর্বি আর শক্তিশালী ক্ষার। তোমরা তেল বা চর্বি হিসেবে নারিকেল তেল ব্যবহার করতে পারো। আর ক্ষার হিসেবে বিদ্যালয়ের ল্যাব থেকে সোডিয়াম অথবা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ব্যবহার করতে হবে।

  ☑ প্রথমে 15gm (আনুমানিক ৩ চা চামচ) $NaOH$ নিয়ে ভালো করে গুঁড়ো করে 50ml পানিতে মিশিয়ে ক্ষারের সল্যুশন তৈরি করে নাও।

  ☑ একটা বড়ো বিকার অথবা পাত্রে 60ml নারিকেল তেল নাও। ক্ষারের সল্যুশনটি ধীরে ধীরে

যোগ করে চামচ অথবা গ্লাসরড দিয়ে নাড়তে থাকো।

☑ অন্য একটি পাত্রে 200ml পানিতে 20gm (আনুমানিক ৪ চা চামচ) সাধারণ খাওয়ার লবণ মিশিয়ে একটি সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করে রেখে দাও।

☑ এরপর তেল ও ক্ষারের মিশ্রণটিকে ১০-১৫ মিনিট তাপ দাও যাতে ভালোভাবে পানি ফুটতে পারে। একই সঙ্গে মাঝে মাঝেই নাড়তে থাকো যতক্ষণ না পাত্রটিতে দুটি স্তর আলাদাভাবে দেখা যাচ্ছে।

☑ তাপ দেওয়া বন্ধ করে আগে থেকে প্রস্তুত রাখা লবণের দ্রবণটি পাত্রে মিশাতে থাকো ও নাড়তে থাকো।

☑ এই মিশ্রণটি খুব ভালোভাবে ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত আনুমানিক ১ ঘণ্টার মতো রেখে দাও।

☑ দেখবে ফোমের মতো একটা অংশ ভেসে উঠেছে। এখন তুমি যে আকারের সাবান বানাতে চাও সে আকারের একটা ছাঁচ নাও। ছাঁচ হিসেবে কোনো বয়ামের মুখ অথবা ছোটো বাটি জাতীয় কিছু ব্যবহার করতে পারো। চামচের সাহায্যে সাবধানে পাত্র থেকে ভাসমান ফোমের মতো অংশকে আলাদা করে নিয়ে ছাঁচে রাখো।

☑ এভাবে সাবধানে ছাঁচটাকে ১ দিন রেখে দাও।

☑ ব্যস, পরদিন এসে দেখবে তোমাদের সাবান প্রস্তুত। পরিষ্কার ও ফেনা হচ্ছে কি না এবার তুমি নিজেই পরীক্ষা করে দেখো।

শেষ কথা

এই শিখন অভিজ্ঞতা শেষ হয়ে গেলেও তোমাদের গবেষণাগারের কাজ তো শেষ হয়ে যাবে না। গত অনেকগুলো সেশনে যতরকম উপকরণ ব্যবহার করেছ, সেগুলো নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখো। কন্টেইনার বা কৌটায় কিছু রাখলে তার উপরে লেবেল করে রেখেছ নিশ্চয়ই। পচনশীল বস্তু তো এভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে না, কিন্তু এর বাইরে তোমাদের সংগৃহীত বস্তুগুলো তোমরা পরবর্তী সময়েও বিভিন্ন পরীক্ষণে কাজে লাগাতে পারবে।

ফিরে দেখা

নিজেদের উদ্যোগে ল্যাবরেটরি তৈরি করতে কেমন লেগেছে? নতুন কোনো চিন্তা মাথায় এসেছে

এই কাজ করতে গিয়ে?

তোমরা যে সাবান তৈরি করেছ তার গুণগত মান কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়?

জীবজগতের বংশলতিকা

আমাদের চারপাশে এই যে অজস্র জীব বাস করে, এসব জীব নিয়েই আমাদের জীবজগৎ, পৃথিবীব্যাপী বিশাল এক পরিবার। এই জীবেরা নিজেরা কীভাবে সম্পর্কযুক্ত, এদের মধ্যে মিল-অমিল কেমন—এই বৃহৎ পরিবারে মানুষের অবস্থানই-বা কোথায়? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এই শিখন অভিজ্ঞতা; চলো, তৈরি করা যাক জীবজগতের বংশলতিকা!

প্রথম ও দ্বিতীয় সেশন

শুরুতেই ভেবে দেখো তোমাদের চারপাশে কত ধরনের জীব তোমরা দেখো? সহপাঠীদের সঙ্গে আলাপ করে নিচের ছকে একটা তালিকা তৈরি করে ফেলো।

ছক-১

জীবের নাম	জীবের নাম	জীবের নাম	জীবের নাম	জীবের নাম	জীবের নাম

উপরের ছকটা একটু ভালো করে লক্ষ করে দেখো। চেনা জীবগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলো একটু মনে মনে চিন্তা করে দেখো, একই ধরনের বৈশিষ্ট্য কোন কোন জীবের মধ্যে দেখা যায়? এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অনেককিছু বিবেচনায় নিতে পারো; যেমন— নিজের খাবার তৈরি করতে পারে কি না (উদাহরণ: বেশির ভাগ পরিচিত গাছ), খাবার গ্রহণের ও পরিপাকের ধরন, আকার-আকৃতি, হাঁটতে-সাঁতরাতে-উড়তে পারে কি না, গায়ে লোম আছে কি না, ইত্যাদি।

নিজেরা আলোচনা করে বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করো। এবার ছক ১ -এর তালিকার কোন কোন জীবের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থিত তা শনাক্ত করে নিচের ছকে টুকে রাখো।

ছক-২

জীবের বৈশিষ্ট্য	জীবের নাম
উদাহরণ : নিজের খাবার তৈরি করতে পারে	

জীবের বৈশিষ্ট্য না হয় শনাক্ত করা গেল। কিন্তু জীবের এই বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারিত হয় কীভাবে? তোমরা ইতোমধ্যে জানো, জীবের গঠনের একক হচ্ছে কোষ। কিন্তু কোষের কোন অংশে জীবের বৈশিষ্ট্যসমূহ ধারণ করে? আর এই বৈশিষ্ট্য কীভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হয়? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়ার আগে চলো জীবকোষের গঠন আরেকবার ঝালাই করে নেয়া যাক।

সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা এককোষী জীব থেকে শুরু করে বহুকোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষের গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছ। কোষের মূল অঙ্গাণু কী কী তা কি মনে আছে? মনে থাকলে নিচে সেগুলোর নাম লিখে রাখো।

....

....

....

....

....

....

....

এবার বলো দেখি, এই তালিকার কোন অঙ্গাণু জীবের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং বংশানুক্রমে প্রবাহিত করে? অনেকেই হয়তো জানো, জীবের সকল বৈশিষ্ট্য তার ডিএনএ -তে জমা থাকে। আর ডিএনএ-এর যে নির্দিষ্ট অংশে কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য থাকে, তাকে বলে জিন। কোষের ভেতরে নিউক্লিয়াসে এই ডিএনএ কীভাবে থাকে তা তোমাদের অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের ‘কোষ বিভাজন’ অধ্যায়ে ছবিতে দেখানো আছে। ছবিটা দেখে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করে দেখো। নিচের ফাঁকা জায়গায় ছবিটা আঁকো।

- নিউক্লিয়াস, নিউক্লিওলাস, ক্রোমোজোম ও তার ভেতরে ডিএনএ কীভাবে সাজানো থাকে তা কি বুঝতে পারছ? অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে কোষ বিভাজন ও বংশগতি, কোষ বিভাজনের গুরুত্ব এবং কোষের গঠন অংশটা পড়ে নিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করো।

তৃতীয় ও চতুর্থ সেশন

- জীবকোষে জীবের বৈশিষ্ট্য কোথায় সংরক্ষিত হয় তা তো জানলে, এখন প্রশ্ন হলো, এই অজস্র জীবের বৈশিষ্ট্যসমূহ কীভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রবাহিত হয়? শৈশব থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত একই বৈশিষ্ট্য কীভাবে আমরা বয়ে নিয়ে বেড়াই? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আগে বোঝা দরকার, জীবের শারীরিক বৃদ্ধি বা বংশবৃদ্ধি কীভাবে ঘটে?

- জীবের বৃদ্ধি বা বংশবৃদ্ধির জন্য কোষীয় পর্যায়ে যে ঘটনাটি ঘটে তা হলো কোষ বিভাজন। এই বিভাজনের আবার রকমফের আছে। এর আগে 'সবুজ বন্ধু' শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে তোমরা অ্যামাইটোসিস, মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোষ বিভাজন সম্পর্কে জেনেছ। এককোষী জীবের ক্ষেত্রে যে অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজিত হয়, আবার বহুকোষী জীবের বৃদ্ধিকালে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষের সমস্ত বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিতভাবে ধারণ করে প্রতিটি কোষ দুটি অপত্য কোষে বিভক্ত হয় তা তোমরা ইতোমধ্যেই জানো। তারপরেও আরেকবার মনে করে নিতে এই দুটি প্রক্রিয়া একবার ঝালিয়ে নাও।

- এবার আসা যাক, মানুষসহ নানা জীবের বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোষীয় পর্যায়ে কী ঘটে সেই বিষয়ে।

- অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে মিয়োসিস কোষ বিভাজনের ধাপগুলো পড়ে দলে আলোচনা করো। খাতায় বা বোর্ডে এঁকে মিয়োসিস ১ ও মিয়োসিস ২ -এর ধাপগুলোতে কী ঘটে এবং কীভাবে একটি ডিপ্লয়েড কোষ থেকে চারটি হ্যাপ্লয়েড কোষ সৃষ্টি হয় সেই প্রক্রিয়া শিক্ষকসহ ক্লাসের বাকিদের সঙ্গে আলোচনা করো।

- এবার আগের প্রশ্নটা আরেকবার ভাবো। জীবের বৈশিষ্ট্যসমূহ কীভাবে এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে প্রবাহিত হয়? পরের সেশনে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হবে।

পঞ্চম সেশন

- এবার জীবের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাজানোর পালা। পৃথিবীর সকল জীবকে যদি একটা পরিবার হিসেবে ধরা যায় তাহলে এই পরিবারের বংশলতিকা কেমন হবে? এই জীবদের কীভাবে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিভুক্ত করা হয়? এরা কীভাবে নিজেদের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত?

- এ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে হলে আগে বংশগতি নির্ধারণে ডিএনএর ভূমিকা একটু বুঝে নেয়া জরুরি।

- যৌন প্রজননের ক্ষেত্রে বাবা মায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো ডিএনএ-এর মাধ্যমে সন্তানের দেহে স্থানান্তরিত হয়। অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে মিয়োসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব এবং বংশগতি নির্ধারণে ক্রোমোজম ও ডিএনএ-এর ভূমিকা সম্পর্কে পড়ে নাও এবং শিক্ষকসহ ক্লাসের বাকিদের সঙ্গে আলোচনা করো।

- বুঝতেই পারছ, ডিএনএ-তে জীবের বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ থাকে, আর যৌন প্রজননের ক্ষেত্রে সেই বৈশিষ্ট্য মিয়োসিসের মাধ্যমে পরের প্রজন্মে যায়।

- এবার একটু ভেবে দেখো, পৃথিবীজুড়ে জীবজগতে যে অফুরন্ত বৈচিত্র্য বিদ্যমান তাতে এই মিয়োসিস কোষ বিভাজনের ভূমিকা কী? সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে নিচে তোমার উত্তর লিখে রাখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

- তোমার উত্তর শিক্ষকসহ ক্লাসের বাকিদের জানাও। অন্যরা কী লিখেছে দেখো। তাদের সঙ্গে দ্বিমত থাকলে যুক্তি দিয়ে তোমার বক্তব্য উপস্থাপন করো।

ষষ্ঠ ও সপ্তম সেশন

- আগের সেশনে জীবজগতের বৈচিত্র্যের সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা হলো। এবার এসব বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এই সুবিশাল জীবজগৎকে কীভাবে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায় তা দেখা যাক।

- এই অভিজ্ঞতার শুরুতেই তোমরা পরিচিত জীবদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তালিকাভুক্ত করেছিলে মনে আছে? একইভাবে পৃথিবীর এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সকল জীবকে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত করা হয়। সেই শ্রেণিবিন্যাসের ধরন দেখলে এসব জীবেরা নিজেদের মধ্যে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত তার একটা ধারণা পাওয়া যায়।

- দলে বলে অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে 'জীবের শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি' অধ্যায় থেকে জীবের শ্রেণিবিন্যাস অংশটুকু পড়ে নিয়ে দলে আলোচনা করো।

- সকল জীবকে তিনটি ডোমেইন বা অধিজগৎ এবং ছয়টি রাজ্যে ভাগ করা হয়েছে তা তো জানলে। এখন নিজেদের পরিচিত জীবের তালিকার দিকে তাকাও। এর মধ্যে কোন জীব কোন ডোমেইন

এবং রাজ্যের আওতায় পড়েছে চিহ্নিত করতে পারবে? দলে আলোচনা করে তোমাদের তালিকা থেকে জীবগুলোর নাম নিচের ছকে নির্দিষ্ট রাজ্য ও ডোমেইনের ঘরে লিখে রাখো।

ছক-৩

ইউক্যারিয়া				ব্যাকটেরিয়া	আর্কি
প্রোটিস্টা	ছত্রাক	উদ্ভিদ	প্রাণী	ইউব্যাকটেরিয়া	আর্কিব্যাকটেরিয়া

- উপরের তালিকায় কোন ডোমেইন ও রাজ্যের জীবের সম্পর্কে তোমরা সবচেয়ে বেশি জানো? কেন কোন নির্দিষ্ট রাজ্যের জীব তোমাদের বেশি পরিচিত তা বলতে পারো?

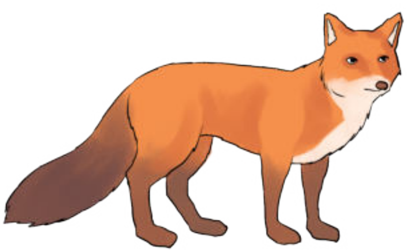

- উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে তোমরা ইতোমধ্যেই জেনেছ (শিখন অভিজ্ঞতা 'সবুজ বন্ধু')। চাইলে উদ্ভিদের এই শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি ও বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে আরেকবার ঝালাই করে নিতে পারো।

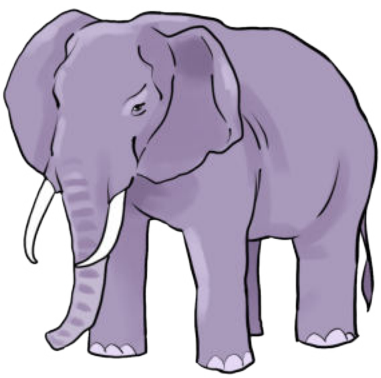

- এবার আসা যাক প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস কীভাবে করা হয় সেই প্রসঙ্গে। দলে বসে প্রাণীজগতের শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি সম্পর্কে ভালোভাবে পড়ে নাও। কোন কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রাণীদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয় তা নিজেরা আলোচনা করো।

- শিক্ষকের সহায়তায় প্রাণিজগতের পর্বসমূহ নিয়ে নিজেরা আলোচনা করো, বিভিন্ন পর্বের বৈশিষ্ট্যের ধরনগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করো।

- এখন তোমাদের কাজ হলো বিভিন্ন পর্বের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ। প্রত্যেক দল লটারির মাধ্যমে যে কোনো একটা পর্ব বেছে নাও। পরের সেশনে তোমাদের নির্ধারিত পর্বের সঙ্গে অন্য পর্বগুলোর অন্তর্ভুক্ত প্রাণীদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে হবে।

অষ্টম ও নবম সেশন

- তোমাদের দলের জন্য নির্ধারিত পর্ব সম্পর্কে ভালোভাবে পড়ে নাও। অন্যান্য পর্বের সঙ্গে তুলনা করে দেখো, এই পর্বের প্রাণীরা কেন অন্যদের থেকে আলাদা। দলে আলোচনা করো।

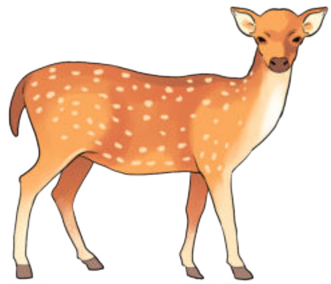

- এবার লটারির মাধ্যমে অন্য যে কোনো একটা পর্ব বেছে নাও। ওই পর্ব নিয়ে কাজ করছে এমন দলের সঙ্গে মিলে যৌথভাবে তোমাদের নির্ধারিত দুটি পর্বের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলোর তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করো।

- সব দলের আলোচনা শেষ হয়ে যাবার পর আবার ছক ১ -এর জীবের তালিকার দিকে লক্ষ করো। তোমাদের বেছে নেয়া জীবদের মধ্যে যারা 'প্রাণী' বা Animalia রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত তাদেরকে কোন পর্বের তা কি তোমরা এখন শনাক্ত করতে পারবে? দলে আলোচনার মাধ্যমে নিচের ছকে পর্বের নাম অনুসারে এই প্রাণীদের শ্রেণিভুক্ত করো।

ছক-৪

পরিফেরা	নিডেরিয়া	প্লাটিহেলমিনথেস	নেমাটোডা	অ্যানিলিডা	আর্থ্রোপোডা	মোলাস্কা	একাইনোডার্মাটা	কর্ডাটা

পরিফেরা	নিডেরিয়া	প্লাটিহেলমিনথেস	নেমাটোডা	অ্যানিলিডা	আর্থ্রোপোডা	মোলাস্কা	একাইনোডার্মাটা	কর্ডাটা

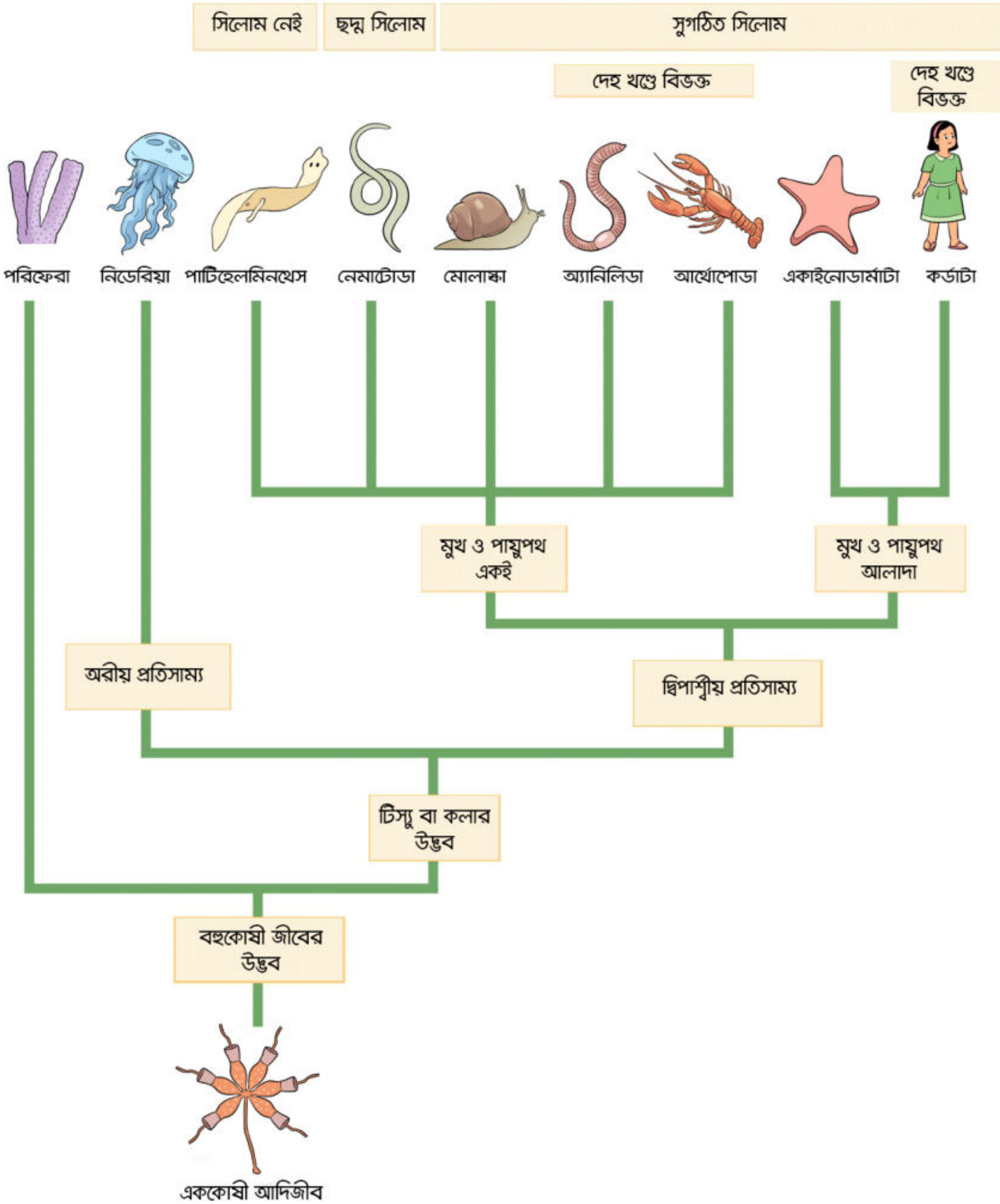
সিলোম নেই
ছদ্ম সিলোম
সুগঠিত সিলোম
দেহ খণ্ডে বিভক্ত
দেহ খণ্ডে বিভক্ত
পরিফেরা
নিডেরিয়া
পাটিহেলমিনথেস
নেমাটোডা
মোলাস্কা
অ্যানিলিডা
আর্থোপোডা
একাইনোডার্মাটা
কর্ডাটা
মুখ ও পায়ুপথ একই
মুখ ও পায়ুপথ আলাদা
অরীয় প্রতিসাম্য
দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য
টিস্যু বা কলার উদ্ভব
বহুকোষী জীবের উদ্ভব
এককোষী আদিজীব

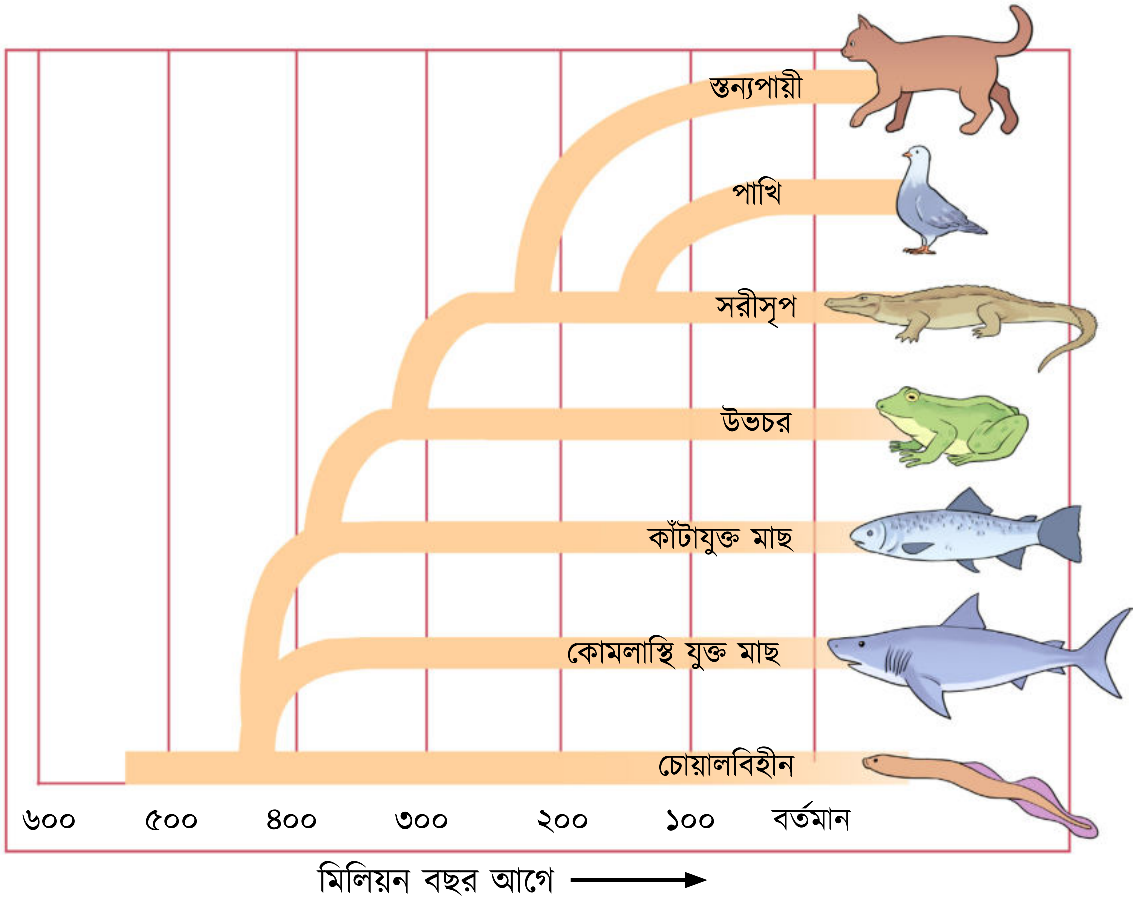

সময়ের সাথে বিভিন্ন শ্রেণির মেরুদণ্ডী প্রাণির উদ্ভব

- তোমাদের তালিকায় সবচেয়ে বেশি এসেছে কোন ধরনের প্রাণী? হিসেব করে দেখো তো।

- তোমরা কি জানো পৃথিবীতে আবিষ্কৃত প্রাণীজগতের শতকরা ৮০ ভাগই কীটপতঙ্গ? তোমাদের তালিকাতেও নিশ্চয়ই অনেক কীটপতঙ্গের কথা এসেছে। কীটপতঙ্গের বৈচিত্র্যময় জগত, এবং পৃথিবীর বাস্তুসংস্থানে এদের ভূমিকা সম্পর্কে অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে একটু জেনে নেয়ার চেষ্টা করো। শিক্ষকসহ ক্লাসের বাকিদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দাও।

দশম ও একাদশ সেশন

- এই যে বিচিত্র বৈশিষ্ট্যময় প্রাণীদের সম্পর্কে জানলে এই বিভিন্ন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি কী করে হলো? কোন পর্বের প্রাণী সবচেয়ে জটিল? বিভিন্ন পর্বের প্রাণীরা নিজেদের মধ্যে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত?

প্রাণিজগতের এই সুবিশাল পরিবারের বংশলতিকা জানতে হলে এদের মধ্যকার সম্পর্ক জানাও জরুরি, একইভাবে কীভাবে এদের বৈশিষ্ট্যসমূহ সময়ের সঙ্গে বিবর্তিত হয়ে সরল থেকে জটিলতর রূপ নিয়েছে তা বোঝাও দরকার।

✎ পরের পৃষ্ঠায় ডায়াগ্রামটা দেখো। আদি এককোষী প্রোটিস্ট থেকে সময়ের সঙ্গে প্রাণীদের বিভিন্ন পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলো কীভাবে জটিল ও সুসংহত হয়েছে তা কি বুঝতে পারছ? শিক্ষকের সহায়তায় ক্লাসের বাকিদের সঙ্গে আলোচনা করো।

✎ কর্ডাটা পর্বে মেরুদণ্ডী প্রাণী ছাড়াও আরও দুটি উপপর্ব আছে তা তোমরা ইতোমধ্যেই জেনেছ। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যেও সাতটি শ্রেণি রয়েছে তাও তোমরা অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে জেনেছ। বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপে এই সাতটি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বহু মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে, সময়ের সঙ্গে তাদের অনেকে বিলুপ্ত হয়েও গেছে।

✎ পরের পৃষ্ঠায় মেরুদণ্ডী প্রাণীদের উদ্ভবের সময়কাল ও ধারাবাহিকতা দেখানো হলো। এই ডায়াগ্রাম দেখে কি বুঝতে পারছ, মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বিবর্তনের ধারাবাহিকতা কেমন? সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করো।

✎ আমরা মানুষ এই তালিকায় কোন পর্বের কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো? মানুষ কর্ডাটা পর্বের মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অন্তর্ভুক্ত তা বলার অপেক্ষা রাখে না, আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে গরু, ছাগল, তিমি, ডলফিনের মতো মানুষও স্তন্যপায়ী প্রাণী। জীবজগতের বংশলতিকা তৈরি করতে হলে মানুষের অবস্থান ঠিক কোথায় তা আরও সুনির্দিষ্টভাবে জানা দরকার। অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে প্রাণিজগতে মানুষের অবস্থান অংশটুকু পড়ে নিয়ে দলে আলোচনা করো।

✎ এবার বংশলতিকা তৈরির পালা। দলে বসে একটা বড়ো কাগজ বা পোস্টার পেপারে প্রাণিজগতের পুরো বংশলতিকা এঁকে দেখাও, যার মূল উদ্দেশ্য হলো এই বৃহৎ পরিবারে মানুষের অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা। এখানে এই বিশাল প্রাণিকুলের মধ্যকার সম্পর্কের ধারাবাহিকতা দেখাতে পারো এভাবে,

রাজ্য (প্রাণী বা Animalia) > পর্ব > উপপর্ব > শ্রেণি > বর্গ > গোত্র > গণ > প্রজাতি

✎ তোমাদের তৈরি করা বংশলতিকা ক্লাসের কোনো একটা ফাঁকা দেয়ালে ঝুলিয়ে দাও। অন্য দলের কাজগুলোও ঘুরে ঘুরে দেখো। শিক্ষকের সহায়তায় সবার সঙ্গে আলোচনায় যোগ দাও।

ফিরে দেখা

তোমার পরিচিত কোন প্রাণির সাথে মানুষের সাথে বৈশিষ্ট্যগত মিল সবচেয়ে বেশি? ব্যাখ্যা করো।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস যেভাবে করা হয়েছে তার মধ্যে কোনটা তোমার কাছে বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয়? কেন?

বাজনার উৎসব

গুনগুন করে গান গাইতে কার না ভালো লাগে! সুন্দর কোনো দিনে তোমার নিশ্চয়ই গান গাইতে ইচ্ছে করে, 'আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে!' এই অভিজ্ঞতায় গুনগুন করে গাওয়া গান কিংবা খেলার মাঠে গলা ফাটিয়ে চিৎকার থেকে শুরু করে যে কোনো শব্দ কীভাবে তৈরি হয়, কীভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে যায় ইত্যাদি জানার মাধ্যমে পদার্থবিজ্ঞানের 'তরঙ্গ' নামক খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সম্পর্কে জানবে।

প্রথম সেশন

- তোমাদের অনেকের বাড়িতে নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র আছে। বাঁশি, হারমোনিয়াম, তবলা, একতারা, গিটার এসব প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র অনেকের বাড়িতেই থাকে। এছাড়াও আরও ব্যতিক্রমধর্মী বাদ্যযন্ত্র থাকতে পারে। তোমরা অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে বাড়ি থেকে যে কোনো একটি বাদ্যযন্ত্র বিদ্যালয়ে আনবে। যদি তোমার বাড়িতে আদৌ কোনো বাদ্যযন্ত্র না থেকে থাকে তাহলেও সমস্যা নেই। তুমি কী জানো এমন অনেক সংগীতশিল্পী আছেন যারা শুধু হাঁড়িপাতিল, পাতার বাঁশি বাজিয়েও সুর তৈরি করেন!

- তাই তুমি যদি আম আঁটির ভেঁপু, পাতার বাঁশি কিংবা ডুগডুগি কোনো একটি বানাতে পারো তাহলে সেটাই বিদ্যালয়ে আনবে। আর যদি একান্তই না পারো তাহলে মন খারাপ করার কিছু নেই, কারণ স্কুলে অন্য বন্ধুরা যা আনবে সেগুলোও তুমি বাজিয়ে দেখতে পারবে।

- বাড়ি থেকে আনা সকলের বাদ্যযন্ত্রগুলো প্রথম ক্লাসেই খুব সাবধানে শ্রেণিকক্ষে অথবা তোমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কক্ষে অনুমতি নিয়ে সাজিয়ে রাখো যাতে কোনো বাদ্যযন্ত্রের ক্ষতি না হয়। কেউ অনুমতি ছাড়া অন্যের বাদ্যযন্ত্র ধরবে না এবং শুধু বিজ্ঞান শিক্ষকের নির্দেশনা মেনেই নির্ধারিত সেশনে এগুলো ব্যবহার করবে। অন্য কোনোভাবে যেন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয় তাই নিজেদেরকেই দায়িত্ব নিয়ে সুন্দরভাবে সেশনটি পরিচালনার জন্য পরস্পরকে সাহায্য করবে।

- সেশনের শুরুতে বেঞ্চ/টেবিল সাজিয়ে বাদ্যযন্ত্রগুলোকে এমনভাবে রাখো যেন ভালোভাবে দেখা যায় এবং ব্যবহার করা যায়।

- এবার শিক্ষকের নির্দেশে ৪ বা ৫টি দলে ভাগ হয়ে যাও এবং ২টি করে দল সুশৃঙ্খলভাবে সামনে গিয়ে বাদ্যযন্ত্রগুলো নেড়েচেড়ে দেখো। কেউ যদি কোনো বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারো তাহলে শ্রেণিকক্ষে বাজিয়েও শোনাতে পারো। তখন খেয়াল রাখো কীভাবে বাজানো হচ্ছে এবং কীভাবে ও কোথা থেকে শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে।

- খুব ভালোভাবে লক্ষ করো বাদ্যযন্ত্রটির গঠন কেমন, কীভাবে একটি বাদ্যযন্ত্র অন্যটির থেকে আলাদা। কোনটা থেকে কেমন শব্দ তৈরি হচ্ছে, কোনটাতে তারে টোকা দিয়ে শব্দ তৈরি করতে হচ্ছে আর কোনটাতে পৃষ্ঠে বাড়ি দিয়ে আঘাত করে অথবা বাতাস দিয়ে ফুঁ দিয়ে বাজাতে হচ্ছে। আঘাত করা বা ফুঁ দেওয়া অথবা টোকা দেওয়া

থামালেই কী শব্দ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কি না ভালো করে খেয়াল করো।

- এবার তোমাদের অনুসন্ধানী পাঠ বইটি খুলে 'কীভাবে শব্দ তৈরি হয়' অংশটুকু দলে বসে পড়ে নাও। সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং বাদ্যযন্ত্রগুলোর গঠন ও কাজের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে বুঝার চেষ্টা করো।

- বই পড়ে তোমরা একটি নতুন শব্দ শিখলে 'তরঙ্গ'। এই শিখন অভিজ্ঞতায় তরঙ্গ ও শব্দ নিয়েই তোমরা অনেক নতুন কিছু জানবে। তরঙ্গকে বুঝতে হলে তার আগে চলো ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়া 'সরল ছন্দিত স্পন্দন গতি' সম্পর্কে আরেকবার ঝালাই করে নেওয়া যাক। অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের 'সরল ছন্দিত স্পন্দন' অংশটুকু আরেকবার পড়ে নাও।

বাড়ির কাজ

- আজকে বাড়িতে গিয়ে একটা মোটামুটি লম্বা সুতা অথবা দড়ির মাথায় কিছুটা ভর বেঁধে দিয়ে কোনো স্থির অবস্থান থেকে ঝুলিয়ে দুলিয়ে দাও। এবার একটা রুলার দিয়ে সুতার দৈর্ঘ্য মেপে $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ সূত্র প্রয়োগ করে দোলনকাল (T) -এর মান বের করো তো। একই ভরের বস্তুকে ঝুলিয়ে সুতার দৈর্ঘ্য কম-বেশি করে T -এর মানের কোনো পরিবর্তন পাও কি না হিসাব করে খাতায় লিখে রাখো।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেশন

- আজকের সেশনে তোমরা তরঙ্গকে আরও ভালোভাবে জানবে। তার আগে চলো ৪/৫টা দলে ভাগ হয়ে কয়েকটা জিনিস জোগাড় করে নেওয়া যাক।

- প্রত্যেক দলের কাছে একটা ৩-৪ মিটার লম্বা দড়ি, সম্ভব হলে নাইলনের দড়ি আছে। জানালার গ্রিলের সঙ্গে দড়িটিকে বেঁধে নাও। অথবা, একপ্রান্ত একজন ধরে রেখে অন্য প্রান্তে একটু জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে দেখোতো একটা ঢেউও দড়ি বেয়ে অপর প্রান্তে যেতে দেখছো কি না?

- এবার একটা স্লিংকি নাও। স্লিংকির একপ্রান্ত কোনো একটা জায়গাতে শক্ত করে আটকে রেখে অথবা কেউ একজন ধরে রেখে অন্য প্রান্তটিকে নিয়মিত সময় ব্যবধানে পরপর কয়েকবার টোকা দিয়ে দেখো তো। কিংবা সামনে সামান্য টেনে ছেড়ে দিয়ে দেখো কী ঘটে। স্লিংকিটিকে কি সামনে

এগিয়ে যেতে দেখছো?

- তোমাদের পরীক্ষণটির ছবি অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ে দেওয়া আছে একটু মিলিয়ে দেখো তো তোমাদের বাস্তব পরীক্ষণের সঙ্গে মেলে কি না (৭.২.২ তরঙ্গের প্রকারভেদ)।
- এবার অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে 'তরঙ্গের ধারণা ও প্রকারভেদ' অংশ দলে বসে পড়ে নাও। আলোচনা করে যেসব উদাহরণ বইয়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলো বাস্তব জীবনের ভিত্তিতেই তাই কারো না কারোর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায় কি না দেখো।
- তোমরা তো জেনেছ, কম্পনের সঙ্গে শব্দের একটা সম্পর্ক আছে। আরও জেনেছ মাধ্যম নিজে না সরে স্পন্দিত হয়ে তরঙ্গকে এগিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে শক্তিকে বয়ে নিয়ে যায়। চলো আরেকটি পরীক্ষণের মাধ্যমে বিষয়টি আরেকটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।
- শিক্ষকের নির্দেশে ৪-৫টি দলে ভাগ হয়ে যাও। প্রত্যেকটা দলে দুটি করে প্লাস্টিকের অথবা কাগজের তৈরি গ্লাস থাকবে। এরকম গ্লাস না পেলে বোতল কেটেও ব্যবহার করতে পারো। আর থাকবে ছিদ্র করার জন্য তীক্ষ্ণ কিছু এবং একেক দলের কাছে একেক ধরনের সুতা অথবা তার।
- প্রথমে গ্লাসের তলদেশে দুটি ছোটো ছিদ্র করে নাও যাতে সুতা বা তারের প্রান্তটা ঢুকানো যায়। তারপর সুতা বা তার এক ছিদ্র দিয়ে ঢুকিয়ে আরেকটা ছিদ্র দিয়ে বের করে এনে গিঁট বেঁধে দাও। চাইলে একটা ছোটো কাঠিও বেঁধে দিতে পারো, যাতে গ্লাসের ছিদ্র গলে সুতাটি বেরিয়ে আসতে না পারে। একইভাবে অপরপ্রান্তে আরেকটি গ্লাস যুক্ত করে ফেলো।
- ব্যস তোমাদের কাপফোন তৈরি। এবার দুপ্রান্তে দুজন গিয়ে সুতা বা তারটিকে টান টান করে ধরে কাপ কানের সঙ্গে ধরে অন্য প্রান্তের কাপের ভেতরে মুখ দিয়ে কাউকে কথা বলতে বলো। দেখো তো কেমন শোনা যায়!
- যেহেতু অন্য দল আরেক ধরনের তার বা সুতা দিয়ে বানিয়েছে তাদেরটায় কথা কেমন শোনা যাচ্ছে তা তুলনা করে দেখতে পারো।
- তরঙ্গ যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে শক্তি (শব্দ শক্তি) নিয়ে যেতে পারে এবার কি ধারণাটা আরও স্পষ্ট হলো?

বাড়ির কাজ

আজকে বাড়িতে গিয়ে একটা গোল বাটির উপর পাতলা পলিথিন টান টান করে পেঁচিয়ে নেবে। বেলুন কেটে এর রাবারটাকেও ব্যবহার করতে পারো। এটার উপর খুব হালকা কিছু যেমন— মুড়ি, জিরা অথবা শুকনো মরিচের বীজ কয়েকটা ছড়িয়ে দাও। এবার একটা স্টিল অথবা কাঁসার প্লেট ঐ বাটিটার পাশে ধরে (তবে স্পর্শ না করে) প্লেটের পৃষ্ঠে বড়ো চামচ দিয়ে

জোড়ে জোড়ে কয়েকবার আঘাত করে শব্দ তৈরি করো। দেখো-তো বাটির উপরের মুড়ি/বীজগুলোর অবস্থার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কি না?

চতুর্থ সেশন

- এবার চলো তরঙ্গ সংক্রান্ত কিছু রাশি সম্পর্কে জেনে নিয়ে একে মাপজোক করতে শিখি।
- অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে 'তরঙ্গের সঙ্গে যুক্ত কিছু রাশি' অংশটা বের করে পড়ো।
- তরঙ্গদৈর্ঘ্য, পর্যায়কাল, কম্পাঙ্ক কাকে বলে বুঝে নাও। পাশের ছবিগুলো দেখার সময় তোমরা দড়ি ও স্প্রিং ব্যবহার করে যে পরীক্ষণ করেছিলে তা স্মরণ করার চেষ্টা করো।
- এই তিনটা রাশির মধ্যে গাণিতিক সম্পর্কের সমীকরণ $v=f\lambda$ কীভাবে পাওয়া গেল তা বুঝার চেষ্টা করো। ধারণা স্পষ্ট করার জন্য প্রয়োজনে শিক্ষকের সহায়তা চাও।
- $v=f\lambda$ একটি চমৎকার গাণিতিক সমীকরণ। কেননা তুমি এটা ব্যবহার করে শব্দের বেগ বের করতে পারবে। চেষ্টা করে দেখো তো নিচের গাণিতিক সমস্যাটি সমাধান করতে পারো কি না।
- কোনো কম্পনশীল শব্দের উৎসের 100টি স্পন্দন সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে সেই সময়ে ঐ উৎস দ্বারা উৎপন্ন শব্দ 140m দূরত্ব অতিক্রম করে। উৎসটির কম্পাঙ্ক 245Hz হলে বাতাসে শব্দের বেগ কত?

- তোমরা পূর্ববর্তী শ্রেণিতে জেনেছ যে আলো চলার পথে বাধা পেয়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে ফিরে গেলে তাকে আলোর প্রতিফলন বলে। যেহেতু আলোর মতো শব্দও একপ্রকার তরঙ্গ তাই শব্দ বাধা পেলে প্রতিফলিত হয়, যাকে আমর প্রতিধ্বনি বলি।

- তবে শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়ার জন্য মূল শব্দ ও প্রতিফলিত শব্দের ব্যবধান ন্যূনতম 0.1s হতে হয়। কারণ এরচেয়ে কম সময়ে অন্য আরেকটি শব্দ আমাদের কানে এসে পৌঁছালে আমাদের সেটি শ্রবণের অনুভূতি হয় না। তাই বাতাসে শব্দ শোনার ক্ষেত্রে (332m/s বেগ ধরে) উৎস ও প্রতিফলক পৃষ্ঠের মধ্যবর্তী দূরত্বও 16.5m হতে হয়। তোমাদের যদি এর সমান বা বড় কোনো হলরুমে যাওয়ার সুযোগ থাকে তাহলে প্রতিধ্বনি শোনা যায় কি না চেষ্টা করে দেখতে পারো।

- তোমরা কেউ কেউ হয়তো মনে করো বাদুরের চোখ নেই শুধু শব্দ ব্যবহার করেই চলে। আসলে তা কিন্তু ঠিক নয়! বাদুরের চোখ আছে, ভালো দেখতেও পায় কিন্তু রাতে সে আল্ট্রাসাউন্ড ব্যবহার করে প্রতিধ্বনির সাহায্যে অন্ধকারে সূক্ষ্ম হিসাব করে সামনে কোথায় বাধা আছে কিংবা খাবার আছে তা শনাক্ত করে চলে। ওরা যে কম্পাঙ্কের শব্দ তৈরি করে তা মানুষ কানে শুনতে পারে না। মানুষ 20 Hz থেকে 20000 Hz কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পারে। প্রতিধ্বনির আরও অনেক ব্যবহার আছে। অনুসন্ধানী পাঠ বই বের করে পাশের সহপাঠীর সঙ্গে পড়ে নাও।

- বইয়ে d=vt/2 সমীকরণের সাহায্যে দুটি গাণিতিক সমস্যার উদাহরণ দেওয়া আছে তা নিজে সমাধান করে খাতায় লেখার চেষ্টা করো।

পঞ্চম সেশন

- তুমি ভাবছো শিখন অভিজ্ঞতার নাম বাজনার উৎসব। তাহলে সেই উৎসবটা কখন হবে, কীভাবে হবে। এই সেশনেই সেটা হবে তবে বাজনা বাজানোর জন্য বাদ্যযন্ত্র তোমাদেরকেই তৈরি করে নিতে হবে।

- তার আগে চলো শব্দের কম্পনের তারতম্যের জন্য শব্দের ধরন কেমন পরিবর্তন হয় তা আরেকটা পরীক্ষণ করে দেখে নেওয়া যাক।

- এই পরীক্ষণের জন্য তোমাদের প্রয়োজন ৮টি একই রকমের কাচের কাপ অথবা গ্লাস। আর দরকার একটা ধাতব চামচ। স্কুলে এরকম একই ধরনের ৮টি গ্লাস আছে কি না দেখো।

- এবার গ্লাসগুলোকে পরপর সাজিয়ে

১ম গ্লাসে একবারে কানায় কানায় পানি পূর্ণ করে নাও, পরে গ্লাসে খানিকটা কম পানি দিয়ে ভরে নাও, তারপরের গ্লাসে আরও একটু কম পানি। এভাবে শেষ গ্লাস পর্যন্ত পানি কমাতে কমাতে শেষেরটা একবারে পানি শূন্য রাখো।

✎ ব্যস জলতরঙ্গ পরীক্ষণের জন্য প্রস্তুত। এবার ধাতব চামচ দিয়ে গ্লাসের কিনারায় আঘাত করে দেখো তো, কোন গ্লাস দিয়ে কেমন শব্দ তৈরি হচ্ছে?

✎ তোমাদের ক্লাসের কেউ যদি স্বরগাম জেনে থাকো তাহলে সুর অনুযায়ী কম্পাঙ্ক টিউন করে নিতে পারো।

সুর	সা	রে	গা	মা	পা	ধা	নি	সা
কম্পাঙ্ক	256Hz	288Hz	320Hz	341Hz	384Hz	427Hz	480Hz	512Hz

✎ তোমরা দেখলে পানির উচ্চতার কম বেশির জন্য শব্দের তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতার কেমন কম-বেশি হচ্ছে। তোমরা এবার যে বাদ্যযন্ত্র বানাবে এই মূলনীতিকে কাজে লাগাতে পারো। আর প্রথম সেশনে বিভিন্ন ধরনের প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রগুলো তো দেখেছই।

✎ শিক্ষকের নির্দেশে ৫-৬ জনের এক একটি দলে বসে পরিকল্পনা করে নাও কেমন বাদ্যযন্ত্র বানাবে। কী কী উপকরণ লাগবে। সেগুলো কীভাবে সংগ্রহ করবে। এগুলো সেশনের পূর্বেই জোগাড় করে রাখবে।

✎ দলের প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে এক একটা বাদ্যযন্ত্রের পরিকল্পনা করো। তোমার পরিকল্পনা নিচে লিখে বা এঁকে রাখো।

- এবার দলের অন্যদের পরিকল্পনা দেখো। তোমারটা সহ বাকি সবার পরিকল্পনা দেখে সিদ্ধান্ত নাও, কোনটি সবচেয়ে ভালো পরিকল্পনা হয়েছে। এবার সবাই মিলে সেই বাদ্যযন্ত্রটি বানাবে। তবে তার আগে যে বাদ্যযন্ত্রটি সবাই মিলে নির্বাচন করলে সেটির পরিকল্পনা বা নকশা নিচে এঁকে বা লিখে রাখো, আর কেন এটিকে নির্বাচন করলে তাও উল্লেখ করতে ভুলো না।

বাদ্যযন্ত্রের পরিকল্পনা বা নকশা	কেন সবচেয়ে কার্যকর ও বাস্তবসম্মত মনে হলো তার যুক্তি

- দলের সবাই কাজ ভাগ করে নাও, পরের সেশনে প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে এসে সেশনেই তৈরি করবে তোমাদের দলের বাদ্যযন্ত্র।

ষষ্ঠ সেশন

- পরিকল্পনা অনুযায়ী দলের সবাই মিলে কাজে লেগে যাও তোমাদের তৈরি বাদ্যযন্ত্র বানানোর কাজে। চাইলে এর একটি নামও দিতে পারো।

- দলে বসে বাদ্যযন্ত্রটি বানানো হয়ে গেলে এটি কীভাবে কাজ করে, কীভাবে সুরের অথবা শব্দের পরিবর্তন হয় তা আলোচনা করে নিচের খালি জায়গাতে ছবিসহ বর্ণনা করে লেখো।

সবশেষে তোমরা চাইলে ক্লাসের সব বাদ্যযন্ত্র মিলিয়ে একটা গান অথবা ছড়াগান বাজিয়ে শোনাতে পারো। সেটা সম্ভব না হলে সবার বানানো বাদ্যযন্ত্র দিয়ে শ্রেণিকক্ষের মধ্যেই একটা প্রদর্শনীর আয়োজনও করতে পারো।

ফিরে দেখা

তোমার সবচেয়ে প্রিয় বাদ্যযন্ত্র কোনটি? এটিতে কীভাবে শব্দ উৎপন্ন হয়?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

তোমাদের অঞ্চলে এমন কোনো বাদ্যযন্ত্র আছে যা একেবারে আলাদা?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

যদি পরিচিত বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রকে শব্দ উৎপন্ন করার প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবদ্ধ করতে বলা হয়, তুমি এদের কীভাবে ভাগ করবে?

পরিবেশ সুরক্ষা

পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টা আমাদের কারো জন্যই নতুন নয়। এর আগে বিভিন্ন শ্রেণিতে পরিবেশ সচেতনতার জন্য তোমরা অনেক কাজ করে এসেছ। কিন্তু তোমার নিজের প্রতিদিনের কার্যক্রমে পরিবেশের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়ে তা কি ভেবে দেখেছ কখনও? এই শিখন অভিজ্ঞতায় প্রত্যেকেই নিজেদের দিকে একটু ফিরে তাকানো যাক, চলো। দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে আমরা অসচেতনভাবে পরিবেশের ক্ষতি করে চলেছি কি না তা খুঁজে দেখা, এবং এর সত্যিকারের সমাধান বের করাই আমাদের এবারের কাজ।

প্রথম সেশন

- পরিবেশ সচেতনতা নিয়ে তোমরা আগে অনেক কাজই হয়তো করেছ, চারপাশের পরিবেশ দূষণ নিয়ে নিশ্চয়ই তোমরাও অনেক বিরক্ত থাকো। কিন্তু এই পরিবেশ দূষণ আসলে কেন ঘটে? আমরা দৈনন্দিন যা যা ব্যবহার করি তার মধ্য থেকেই তো এই বর্জ্য উৎপন্ন হয়। আর এই বাসাবাড়ির বর্জ্যের বাইরে কলকারখানা, হাসপাতাল ইত্যাদি উৎস থেকেও বিভিন্ন বর্জ্য উৎপন্ন হয় যা পরিবেশকে দূষিত করে থাকে।

- প্রথমেই দেখা যাক, তোমাদের স্কুলে প্রতিদিন কী পরিমাণ বর্জ্য উৎপন্ন হয়। ৫/৬ জনের দলে ভাগ হয়ে যাও। দলের সবার সঙ্গে কথা বলে তোমার খাতায় নোট নাও, আজকে সারাদিন কী কী ময়লা আবর্জনা তোমার দলের সবাই মিলে ফেলেছ (চকলেট বা চিপসের প্যাকেট থেকে শুরু করে টিস্যু পেপার সবকিছুই এর মধ্যে পড়ে)। সবার তথ্য পেয়ে গেলে তোমার দলের তথ্য যোগ করে নিচের ছকে টুকে রাখো।

ময়লার ধরন	পরিমাণ

- এবার ক্লাসের বাকি দলগুলোর সঙ্গে তোমাদের তথ্য বিনিময় করে দেখো। সব দলের তথ্য যোগ করলে কী পরিমাণ বর্জ্য একদিনে শুধু তোমাদের ক্লাস থেকেই উৎপন্ন হচ্ছে একবার ভেবে দেখো তো?

- এবার তোমাদের স্কুলের মোট কতগুলো ক্লাসরুম, সেখানে মোট কত সংখ্যক শিক্ষার্থী আছে ভেবে দেখো। একদিনে আনুমানিক কী পরিমাণ বর্জ্য তোমাদের স্কুল থেকেই উৎপন্ন হয় তা কি তোমরা অনুমান করতে পারো? একটু হিসাব করে দেখো তো!

- বর্জ্য উৎপাদন নিয়ে ভাবতে হলে আরেকটা বিষয় নিয়ে ভাবা জরুরি, তা হলো সম্পদের ব্যবহার। প্রতিদিনের জীবনে কত ধরনের দ্রব্য আমরা ব্যবহার করি, কত রকম সম্পদের ব্যবহার করি, কী পরিমাণ ব্যবহার করি। আগামী সেশনের আগে তোমাদের কাজ হলো একদিনে তোমরা সম্পদের ব্যবহার, এবং বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ রেকর্ড করা।

- এই তথ্য রেকর্ড রাখার জন্য নিচের নমুনা ছকের মতো একটি ছক তোমরা চাইলে ব্যবহার করতে পারো।

ছক ১

তারিখ:

ব্যবহৃত জিনিস/দ্রব্য/ সম্পদ (উদাহরণ : খাবার, পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, অর্থ, ইত্যাদি)	ব্যবহৃত জিনিস/দ্রব্য/ সম্পদের পরিমাণ	উৎপাদিত বর্জ্যের ধরন (উদাহরণ : পলিথিনের প্যাকেট, ময়লা পানি, খাবারের উচ্ছিষ্ট, ধোঁয়া, ইত্যাদি)	উৎপাদিত বর্জ্য ও পরিমাণ

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

তারিখ:

ব্যবহৃত জিনিস/দ্রব্য/ সম্পদ (উদাহরণ : খাবার, পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, অর্থ, ইত্যাদি)	ব্যবহৃত জিনিস/দ্রব্য/ সম্পদের পরিমাণ	উৎপাদিত বর্জ্যের ধরন (উদাহরণ : পলিথিনের প্যাকেট, ময়লা পানি, খাবারের উচ্ছিষ্ট, ধোঁয়া, ইত্যাদি)	উৎপাদিত বর্জ্য ও পরিমাণ

দ্বিতীয় সেশন

- বাসায় বসে তোমরা নিশ্চয়ই নিজেদের ব্যবহৃত দ্রব্য বা সম্পদের হিসেব রেখেছ? পাশাপাশি নিজের উৎপন্ন বর্জ্যের তালিকাও নিশ্চয়ই করেছ?

- এখানে বলে রাখা ভালো, সম্পদ বলতে আমাদের ব্যবহার্য সবকিছুই বোঝায়। আবার আমাদের ব্যবহার্য সকল দ্রব্য কোনো না কোনো প্রাকৃতিক উৎস থেকেই আসে। তোমার ব্যবহৃত জামার সুতা হয়তো এসেছে রেশম গুটি থেকে, আবার হাতের পেন্সিলটির শিষ এসেছে গ্রাফাইটের খনি থেকে

আর কাঠের অংশ এসেছে কোনো একটি গাছের কাঠ থেকে। বাসায় টিউবলাইট বা বৈদ্যুতিক পাখা চলতে যে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহৃত হয় তা হয়তো উৎপাদিত হয়েছে কোনো এক বিদ্যুৎকেন্দ্রে যার মূল জ্বালানি হলো কয়লা। এই যে গাছ, কয়লা, পানি, খনির গ্রাফাইট—এ সবই প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক এসব সম্পদের কোনো কোনোটা খরচ করে ফেলার পর প্রাকৃতিকভাবেই পূরণ হয়ে যায়, আবার কোনো কোনোটি খরচ হয়ে গেলে তা পূরণ হতে অনেক অনেক সময় লেগে যায়।

তোমাদের অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের ‘নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য সম্পদ’ অধ্যায় থেকে সম্পদ, সম্পদের বৈশিষ্ট্য, নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য সম্পদের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য—এই বিষয়গুলো পড়ে নাও। দলে আলোচনা করে দেখো, সম্পদ সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা তৈরি হলো?

ছক ১ -এ তোমরা যে তথ্য সংগ্রহ করেছ তা শুধুই একদিনে তোমাদের ব্যবহার্য দ্রব্যের হিসাব দিচ্ছে। একইভাবে দুই সপ্তাহ টানা যদি এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয় তাহলে কেমন হয়? সেই হিসাব থেকে তোমার নিয়মিত জীবনে সম্পদের ব্যবহারের একটা হিসাব পাওয়া যাবে, তাই না?

একটা ডায়রি বা খাতায় আগামি ১৫ দিন ছক ১ -এর মতো একটা করে ছক এঁকে প্রতিদিনের ব্যবহার্য দ্রব্যের তালিকা ও পরিমাণ, এবং উৎপন্ন বর্জ্যের তালিকা ও পরিমাণ রেকর্ড করো। প্রতিদিনের তারিখটা ছকের উপরে লিখে রাখতে ভুলো না যেন!

তৃতীয় থেকে অষ্টম সেশন

নিজের ব্যবহৃত সম্পদের হিসাব রাখতে রাখতে এই কদিন একটু অন্য কাজে লাগানো যাক! আগের সেশনে তোমরা অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য সম্পদ সম্পর্কে জেনেছ। আগামী কয়েকটা সেশনে এই বিভিন্ন ধরনের সম্পদ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জেনে নিতে পারো। এই অধ্যায়ের বিভিন্ন অংশ দলে পড়ে নিজেরা আলোচনা করে দেখতে পারো, শিক্ষকের সঙ্গেও আলাপ করতে পারো।

সম্পদের অনেক ধরন থাকলেও সব আমাদের হাতের কাছে থাকে না। আবার অনেক সম্পদ; বিশেষত খনিজ সম্পদ পৃথিবীর সব ভূখণ্ডে একই রকম সহজলভ্য হয় না। বাংলাদেশে কোন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ সহজলভ্য? এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ‘বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ’ অধ্যায় থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের খনিজ সম্পদ থেকে জেনে নিতে পারো। দলে বসে আলোচনা করে বিভিন্ন ধরনের খনিজ সম্পদ পরের পৃষ্ঠায় দেয়া বাংলাদেশের মানচিত্রে চিহ্নিত করে নাও।

এবার অন্যান্য দলের সঙ্গে আলাপ করে দেখো তারা নতুন কী জেনেছে।

আমাদের ব্যবহৃত সকল দ্রব্যের জন্যই আমরা প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ফলে প্রকৃতির ওপর কী প্রভাব পড়ে? তা জানার জন্য একই অধ্যায়ের বাকি অংশগুলো পড়ে নিতে পারো।

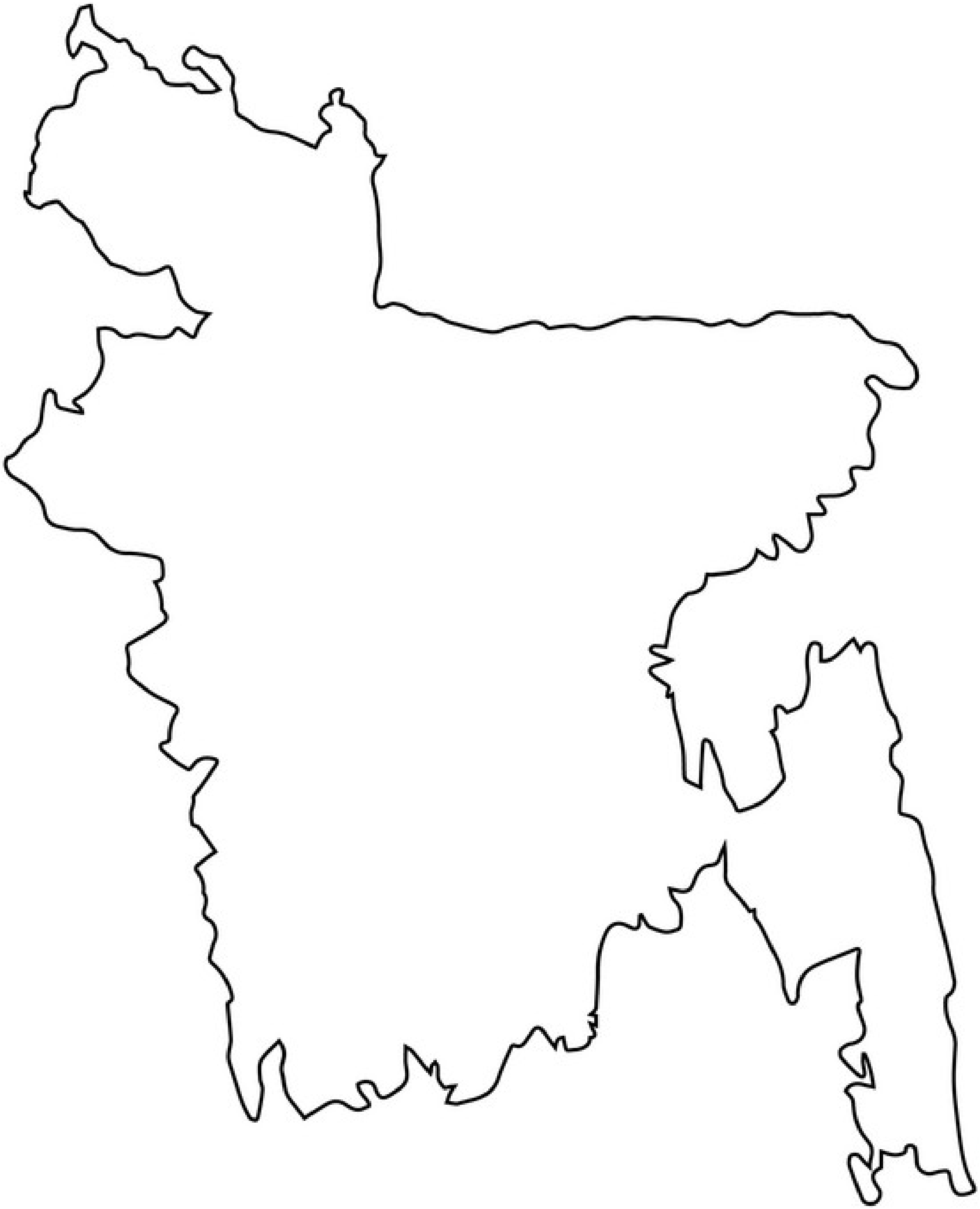

নবম সেশন

- গত দুই সপ্তাহ তোমাদের নিজেদের প্রতিদিনের ব্যবহার্য দ্রব্যের তালিকা ও পরিমাণ, এবং উৎপন্ন বর্জ্যের তালিকা ও পরিমাণ রেকর্ড করেছ নিশ্চয়ই? এই ফাঁকে তোমাদের বিভিন্ন ধরনের সম্পদ সম্পর্কেও ধারণা হয়েছে। এবার তোমাদের নিজেদের তথ্যগুলো একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

- তোমাদের ব্যবহৃত দ্রব্যগুলোর মূল উৎস কী? নিজেরা দলে আলোচনা করে দেখো। এবার একটু হিসাব করে দেখো, মাত্র দুই সপ্তাহে তোমাদের এই কজনের উৎপাদিত বর্জ্যের পরিমাণ কত? ক্লাসের সবার তথ্য হিসাব করলে এই পরিমাণটা কোথায় গিয়ে ঠেকছে?

- আবার অন্যভাবে ভেবে দেখো, তোমার পরিবারে মোট সদস্য কতজন? তোমার একার উৎপাদিত বর্জ্যের পরিমাণের সঙ্গে তুলনা করে অনুমান করো, শুধু তোমার বাড়িতেই দুই সপ্তাহে মোট কী পরিমাণ বর্জ্য উৎপাদন হয়েছে? এই হিসেবটা এক বছর ধরে করলে পরিমাণটা কোথায় দাঁড়াচ্ছে?

- বর্জ্য উৎপাদনের সঙ্গে পরিবেশ দূষণের সম্পর্ক নিয়ে নিশ্চয়ই নতুন করে আলোচনার প্রয়োজন নেই? এখন প্রশ্ন হলো, কী করলে বর্জ্যের পরিমাণ কমিয়ে আনা যায়? তোমার তথ্যের তালিকা একবার খুঁটিয়ে দেখো তো, তালিকার কোন কোন দ্রব্য বা জিনিস তুমি ব্যবহার করেছ যেটা ব্যবহার না করলেও হতো? এইসব জিনিসের পরিবেশের উপর কী প্রভাব পড়ছে? দলে আলোচনা করে নিচের তালিকায় এই দ্রব্যগুলোর নাম লিখে রাখো।

ছক-২

ব্যবহৃত জিনিস/ দ্রব্য/সম্পদ	কোন কোন দ্রব্য ব্যবহার না করলেও চলত	পরিবেশের উপর প্রভাব

ব্যবহৃত জিনিস/দ্রব্য/সম্পদ	কোন কোন দ্রব্য ব্যবহার না করলেও চলত	পরিবেশের উপর প্রভাব

ব্যবহৃত জিনিস/ দ্রব্য/সম্পদ	কোন কোন দ্রব্য ব্যবহার না করলেও চলত	পরিবেশের উপর প্রভাব

দশম সেশন

গত সেশনে তোমরা পরিবারের সম্পদের ব্যবহার এবং গৃহস্থালি বর্জ্যের পরিমাণ হিসাব করেছ। এবার এই বর্জ্য উৎপাদনের মাধ্যমে পরিবেশ কীভাবে দূষিত হয়, তা খুঁটিয়ে দেখা যাক। বিভিন্ন বর্জ্য থেকে পরিবেশ কীভাবে দূষিত হয় এবং দূষণের কারণ কী, তা নিচের ছকে লিপিবদ্ধ করো।

ছক-৩

উৎপাদিত বর্জ্য	পরিবেশের যেসব উপাদান দূষিত হয় এবং দূষণের কারণ

✎ তোমাদের দলের কাজের উপর অন্যান্য দলের শিক্ষার্থীদের মতামত নেয়ার জন্য সকলের সামনে উপস্থাপন করো। এভাবে সকল দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। অন্যান্য দলের মতামতের ভিত্তিতে নিজ দলের কাজ নিয়ে আবার ভাবতে পারো।

✎ দৈনন্দিন কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশের কোন উপাদান দূষিত হয় তা জেনেছ। দূষণের কারণ সম্পর্কেও জেনেছ। এখন দূষণ রোধ করার উপায় বের করার পালা। পরিবেশের ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের দূষণ রোধ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপায় প্রয়োগ করতে হয়। তবে তার আগে তোমরা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অধ্যায় থেকে বনজ সম্পদ, পানি সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ফলে পরিবেশের উপর প্রভাব, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অংশটুকু আরেকবার পড়ে নিতে পারো।

ছক ৪

দূষণের নাম	দূষণ রোধ করার উপায়সমূহ
পানি	➢ ময়লা-আবর্জনা পানিতে না ফেলা। ➢ কৃষিজমিতে পরিমিত পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা। অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার না করা। ➢ স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করা।

	➢ ➢ ➢
	➢ ➢ ➢
	➢ ➢ ➢
	➢ ➢ ➢

বাড়ির কাজ

প্রতিদিনের কাজ থেকে পরিবেশ দূষণ, দূষণের কারণ এবং তা রোধ করার উপায় সম্পর্কে জেনেছ। একদিকে বর্জ্য পদার্থ উৎপাদন যেন হ্রাস পায়, তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। অপরদিকে বর্জ্য পদার্থকে পুনঃব্যবহার ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করে দূষণ হ্রাস করতে হয়। দূষণ কমিয়ে আনতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। তোমার এলাকায় বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা কীভাবে হয়? কারা এই দায়িত্বে আছেন? বাসাবাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহের পর সেগুলো কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়? পরের সেশনের আগে এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে ছক ৫ -এ লিখে নিয়ে এসো। নিচের ছকে কিছু নমুনা প্রশ্ন দেয়া হলো, তোমরা নিজেদের কৌতূহল মেটাতে অন্য প্রশ্নের উত্তরও খুঁজতে পারো।

ছক ৫

কারা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছেন? তাদের কার ভূমিকা কী?	
বর্জ্য সংগ্রহ কীভাবে করা হয়?	
বর্জ্য সংগ্রহ করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়?	
বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য আলাদা করার ব্যবস্থা আছে কি না?	
বর্জ্য পদার্থকে পুনঃব্যবহার ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করার ব্যবস্থা আছে কি না?	
অপচনশীল বর্জ্য শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে জমা হয়?	

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সেশন

- এই সেশনে তোমাদের দলের সদস্যদের আনা তথ্যগুলো নিয়ে আলোচনা করো। তোমাদের এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যে প্রক্রিয়ায় করা হয় তা কতটা কার্যকরী? আরও ভালো কীভাবে করা যেত? নিজেরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নাও।

- এবার তোমাদের একটা জরুরি কাজ করতে হবে, তা হলো নিজেদের এলাকার জন্য সবচেয়ে উপযোগী বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মডেল তৈরি করা। এবং এই কাজটি যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে করা দরকার যাতে সত্যি সত্যি তা বাস্তবায়ন করা যায়। তোমাদের স্থানীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সামনে এই মডেল তোমরা উপস্থাপন করতে পারো যাতে তা আসলেই এলাকার উন্নয়নে কাজে আসে। তবে এই মডেল বানানোর আগে তোমাদের নিজেদের কিছু বিশ্লেষণ করে নিতে হবে।

- বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য সম্পর্কে ইতোমধ্যেই তোমরা ধারণা পেয়েছ। এখন একটু ভেবে দেখো, এসব বর্জ্যের মধ্যে কোনগুলো পুনর্ব্যবহারযোগ্য? কিংবা কোনগুলো ব্যবহার না করলেও চলে? কোনগুলো ফেলে না দিয়ে অন্য কাজে লাগানো যায়? Reuse, Reduce, Recycle এই তিনটি কথার সঙ্গে নিশ্চয়ই ইতোমধ্যেই তোমাদের পরিচয় ঘটেছে। নিজেদের ১৫ দিনের উৎপন্ন বর্জ্যের তালিকা (ছক ১) দেখে নিচের ছক পূরণ করো।

উৎপন্ন বর্জ্য	পচনশীল নাকি অপচনশীল	পুনর্ব্যবহারযোগ্য কি না, হলে কীভাবে	কোনগুলো ব্যবহার না করলেও চলে, কিংবা ব্যবহার সীমিত করা সম্ভব	কোনগুলো ফেলে না দিয়ে অন্য কাজে লাগানো যায়

✎ এবার ভেবে দেখো পচনশীল বর্জ্যগুলো কীভাবে ব্যবস্থাপনা করলে পরিবেশ দূষণ সবচেয়ে কম হবে? উদাহরণস্বরূপ, প্রতিদিন রান্নাঘরে যেসব বর্জ্য উৎপন্ন হয়, সেগুলো থেকে কম্পোস্ট সার তৈরি করা যায় যেগুলো স্থানীয় নার্সারি, ছাদবাগান বা কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে (কম্পোস্ট সার তৈরির প্রক্রিয়া তোমরা যেকোনো কৃষিবিদ, নার্সারির কর্মী, বা কৃষিজীবির কাছ থেকে জানার চেষ্টা করতে পারো)। আবার অপচনশীল বর্জ্যের ক্ষেত্রে কী করণীয়?

✎ যেসব বর্জ্য পদার্থের পুনঃব্যবহার করা যায় বলে ভেবেছ, সেগুলো নিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করো। তোমাদের তালিকা প্রয়োজনে পরিবর্তন করো। পুনঃব্যবহার করা যায় এরূপ বর্জ্য পদার্থসমূহকে দু ভাগে ভাগ করো। যেগুলোকে কোনোরকম প্রক্রিয়া (Treatment) ছাড়া

পুনঃব্যবহার করা যায় সেগুলোকে পৃথক করো।

প্রক্রিয়া (Treatment) ছাড়া পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্য পদার্থ	প্রক্রিয়া (Treatment) সহ পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্য পদার্থ

- দলে আলোচনা করো, প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞদের সহায়তা নিতে পারো।

- এবার সবচেয়ে কার্যকর কী উপায়ে বর্জ্য সংগ্রহ করলে এর ব্যবস্থাপনা সবচেয়ে সহজ হয় ভেবে দেখো। আবার এই বর্জ্য সংগ্রহের পরে কী করা হবে, কীভাবে পরিবেশের দূষণ সবচেয়ে কম ঘটবে, একই সঙ্গে সম্পদের অপচয়ও রোধ করা যাবে এই বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে দলের সকলে মিলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটা কার্যকর মডেল তৈরি করো।

- তোমাদের মডেলের পরিকল্পনা করার সময় নিচের প্রশ্নগুলো মাথায় রাখতে পারো।

☑ বর্জ্য সংগ্রহ কীভাবে করা হবে?

☑ পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য কীভাবে আলাদা করা হবে?

☑ পচনশীল বর্জ্য কাজে লাগানোর উপায় কী হবে?

☑ অপচনশীল বর্জ্য কোথায় জমা করা হবে?

☑ অপচনশীল বর্জ্যের মধ্যে যেগুলো পুনর্ব্যবহারযোগ্য সেগুলো কীভাবে আলাদা করা হবে? কীভাবে সেগুলো কাজে লাগানো হবে?

- সব দলের কাজ হয়ে গেলে একটা দিন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করো, যেখানে এই বিষয়ের কমিউনিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ছাড়াও তোমাদের কাউন্সিলর বা মেম্বাররা উপস্থিত থাকতে পারেন। তাদের কাছ

থেকে মূল্যবান মতামত নেয়ার পাশাপাশি কীভাবে এই মডেল সত্যিকার অর্থে ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ নিতে পারবে।

✎ এবার একটু ভেবে দেখো, কোন দলের তৈরি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মডেল তোমার কাছে সবচেয়ে কার্যকরী মনে হয়েছে? কেন?

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

ফিরে দেখা

✎ তোমাদের দলের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মডেল সম্পর্কে সবার মতামত কী ছিল?

....
....
....
....

....

....

....

....

....

✎ তোমাদের দলের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মডেলে কী ধরনের পরিবর্তন আনলে তা আরও কার্যকর হতো?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

✎ এই অভিজ্ঞতার কাজ করার পর ব্যক্তিগত জীবনে সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তোমার ভূমিকায় কী ধরনের পরিবর্তন আসবে?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

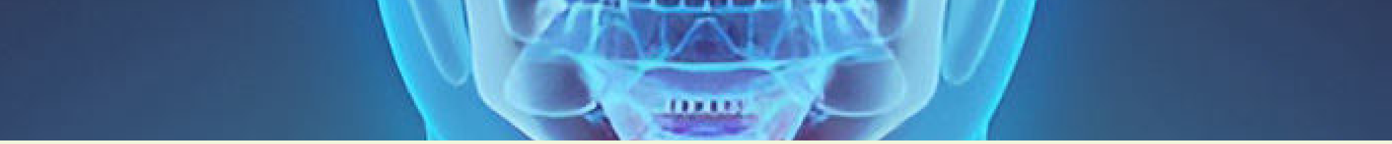

শরীর নামের অবিশ্বাস্য যন্ত্র

একটি যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ যেমন আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন কাজ করার মাধ্যমে একটি সামগ্রিক কাজ সম্পাদন করে তেমনি আমাদের মানব শরীরকেও একটি বড়ো যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মানবশরীরের বিভিন্ন সিস্টেম বা তন্ত্র নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে আমাদের পুরো শরীর নামের সিস্টেমটিকে সচল রাখে, এবং সাম্যাবস্থায় রাখে। আগের শ্রেণিতেও তোমরা মানবশরীরের কয়েকটি তন্ত্র সম্পর্কে জেনেছ, এবার এই শ্রেণিতেও একইভাবে আরও কয়েকটি তন্ত্র কীভাবে নিজেদের মধ্যকার আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম চালু রাখে সেটাই দেখা যাক!

ধাপ-১

প্রথম ও দ্বিতীয় সেশন

- ভুল করে কোনো গরম কিছু ছুঁয়ে ফেললে আমরা কী করি? ঝট করে হাতটা সরিয়ে নিই, তাই তো? যদি সরিয়ে না নিতাম তাহলে একটু পরে হয়তো হাতে ফোস্কা পড়ে যেত। আবার ঠান্ডা বরফ অনেকক্ষণ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেও কষ্ট হয়, মনে হয় হাত অবশ হয়ে আসছে। এই যে ঠান্ডা গরমের অনুভূতি, তা আমরা শরীরের কোন অংশ দিয়ে টের পাই বলো তো?

- ঠিক ধরেছ, স্পর্শের অনুভূতি আমরা পাই আমাদের ত্বকের মাধ্যমে। খোসা যেমন ফল বা সবজির ভিতরের অংশকে সুরক্ষিত রাখে, তেমনি আমাদের শরীরকে আবৃত করে রাখে ত্বক। শরীরের কোনো অংশের ত্বকে কাটাছেঁড়া হলে আমরা ব্যথার মাধ্যমে টের পাই। আবার তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ, শরীরের কোথাও কোথাও স্পর্শ করলে একটু বেশি তীব্র অনুভূতি হয় আবার কোথাও কোথাও একটু কম। বন্ধুদের কাতুকুতু দিয়ে নাস্তানাবুদ তো তোমরা হরহামেশাই করে থাকো।

- বলো তো শরীরের কোন কোন অংশে কেটে গেলে আমরা ব্যথা পাই না, কিংবা স্পর্শের অনুভূতি পাই না? একটু ভেবে নিচে লিখে রাখো তোমার উত্তর :

- চলো একটা মজার কাজ করা যাক—

- জোড়ায় বসে এই কাজটি করতে হবে। একজন চোখ বন্ধ করে অথবা চোখ বাঁধা অবস্থায় তার হাতে কলম বা পেন্সিলের উল্টো প্রান্ত দিয়ে তার বাহুর ত্বকে কিছু পরিচিত শব্দ লেখো। যেমন হতে পারে—কলম, পতাকা, ছাগল ইত্যাদি।

- চোখ বাঁধা অবস্থায় বলতে হবে তোমার বন্ধু হাতে কী লিখেছে। এভাবে দুজন দুজনের হাতে কলমের উল্টো দিক দিয়ে লিখে খেলাটি খেলতে পারো।

- এখন ভেবে দেখো, এই অনুভূতির বাইরেও ত্বক আরও কিছু কাজ সম্পন্ন করে। গরমের দিনে আমাদের ঘাম হয় খেয়াল করেছ নিশ্চয়ই। একটু খেয়াল করে দেখো তো, আমরা কেন ঘামি, কখন ঘামি? শীতকালে ঘাম কেন হয় না?

ত্বকের কাজ কী? ত্বকের গঠন আসলে কেমন? জানার জন্য অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের ‘মানবদেহের অঙ্গ ও তন্ত্র’ অধ্যায় থেকে ত্বকতন্ত্র অংশটি বের করো। ৫/৬ জনের দলে বসে এই অংশটি পড়ে আলোচনা করো। পড়া হয়ে গেলে শিক্ষকসহ ক্লাসের বাকিদের সঙ্গে আলাপ করো।

ত্বকের কোন অংশগুলো আমরা দেখতে পাই না বলো তো? তোমার উত্তর নিচে লিখে রাখো।

এবার একে একে প্রতি দল থেকে একজন দাঁড়িয়ে ত্বকের যে অংশগুলো দৃশ্যমান সেগুলো নিজেদের শরীরে চিহ্নিত করে দেখাও এবং অংশগুলোর বর্ণনা দাও। প্রয়োজন হলে অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের সাহায্য নাও।

আমাদের কেন ঘাম হয়? ত্বকের কোন অংশে কীভাবে ঘাম নিঃসরণ হয়? তোমাদের উত্তর নিচে লিখে রাখো।

ত্বকতন্ত্র সম্পর্কে তো জানলে; এখন একটু ভেবে দেখো আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখতে, স্থিতিশীল রাখতে ত্বকের কী কী কাজ করতে হয়? অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের সাহায্য নিয়ে তোমাদের উত্তর নিচে লিখে রাখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ত্বক আমাদের শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এর যত্ন নেওয়াও তাই খুব জরুরি। কীভাবে ও কেনো ত্বকের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন এ বিষয়ে সবাইকে সচেতন করাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে কিংবা খেলাধুলার পর তোমরা নিশ্চয়ই ভালো করে হাত-মুখ ধোও কিংবা গোসল করো। এছাড়াও আরও কীভাবে ও কখন কখন বিশেষ করে ঋতুভেদে কীভাবে ত্বকের যত্ন নেওয়া যায় তা দলে আলোচনা করো। আলোচনা হয়ে গেলে ক্লাসের বাকিদেরকে তোমাদের মতামত জানাও, অন্যদের মতামতও শোনো।

বাড়ির কাজ

মানুষের মতো অন্য সকল প্রাণীর শরীরেই তো ত্বক রয়েছে। কিন্তু সব প্রাণীর ত্বকের কাজ কি হুবহু একই? শ্বেত ভল্লুক, কচ্ছপ, সজারু এরকম আরও কিছু প্রাণী বেছে নিয়ে ভেবে দেখো তো এদের ত্বকের ধরনে কী কী বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে? এই বৈশিষ্ট্যগুলো এদের কী ধরনের বাড়তি সুবিধা দেয়?

প্রাণীর নাম	ত্বকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য	এই বৈশিষ্ট্যগুলো এদের যেসব বাড়তি সুবিধা দেয়
শ্বেত ভল্লুক		
কচ্ছপ		
সজারু		
গিরগিটি		

প্রাণীর নাম	ত্বকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য	এই বৈশিষ্ট্যগুলো এদের যেসব বাড়তি সুবিধা দেয়

ধাপ-২

তৃতীয় সেশন

- কোনো যন্ত্র চালাতে যেমন জ্বালানি লাগে ঠিক তেমনি আমাদের শরীরকে চালাতেও জ্বালানি লাগে। প্রাণী বা মানব শরীরে লাগে পানি, খাদ্য আর অক্সিজেন। তোমরা সপ্তম শ্রেণিতে 'হজমের কারখানা' অভিজ্ঞতায় খাদ্য পরিপাক সম্পর্কে জেনেছ। পরিপাককৃত খাদ্য থেকে শক্তি উৎপাদনের জন্য চাই অক্সিজেন। অক্সিজেন খাদ্যকে জারিত করে তাপশক্তি উৎপন্ন করে যা আমাদের শরীরকে সচল রাখে। এই তন্ত্রকে শ্বসনতন্ত্র বলে।

- তুমি খেয়াল করলে দেখবে শুধু খাবার খেলেই যে আমরা শক্তি পাব তা কিন্তু নয়। তোমরা সবাই জানো বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য ছাড়াও আমাদের প্রয়োজন হয় অক্সিজেন যা আমরা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করি। চলো এবার জেনে নেওয়া যাক আমাদের শরীরের কোন অংশে এই শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়।

- তার আগে চলো কয়েকবার গভীর দম নিয়ে শুরু করা যাক। নাক দিয়ে ধীরে ধীরে বুক ফুলিয়ে নিঃশ্বাস নাও। কয়েক সেকেন্ড ধরে রেখে ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ো। এরকম করে দুই থেকে মিনিট কাজটির পুনরাবৃত্তি করো।

- এবার চলো শ্রেণির সবাই মিলে একটা মজার কাজ করা যাক। এজন্য শ্রেণির সবাই হাতে একটি বেলুন নাও। শিক্ষক তোমাদেরকে বেলুনের ব্যবস্থা করে দিতে সহায়তা করবেন।

- বুক ভরে দম (নিঃশ্বাস) নিয়ে একবার মাত্র ফুঁ দিয়ে (নিঃশ্বাস ছেড়ে) কে কত বড়ো বেলুন ফুলাতে পারো তা দেখা যাক।

- বেলুন ফুলানো হলে, বাতাস না ছেড়ে সাবধানে গিঁট দিয়ে মুখটা বন্ধ করে হাতে ধরে রাখো। এবার চোখের অনুমানের ভিত্তিতে কার বেলুন কতবড়ো তা দেখো তো! তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছো,

সবার ফুসফুসে বাতাস ধারণ ক্ষমতা এক নয়। কারো বেশি, কারো কিছুটা কম। কেনো কম বা বেশি বলে মনে হয় বলে তোমাদের মনে হয়, শ্রেণিতে তোমার ধারণা সবার সঙ্গে শেয়ার করো। (একবার মাত্র ফুঁ দিয়ে কেউ কি বেলুনটাকে ফাটিয়ে ফেলতে পেরেছ? তাহলে বুঝতে হবে তার ফুসফুসের অনেক জোর!)

✎ এখন আমাদের সবার শ্বাসের গতি কি সমান? আরেকটা ছোটো পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতি মিনিটে তোমরা কে কতবার শ্বাসপ্রশ্বাস নাও তা গুনে দেখা যাক।

✎ শুরুতেই সবাই একদম ধীর-স্থিরভাবে তোমাদের আসনে বসো। শিক্ষকসহ তোমরা সবাই এক মিনিটে কতবার দম নিচ্ছ, ও নিঃশ্বাস ছেড়ে দিচ্ছ তার হিসাব রাখতে হবে। ক্লাসের এক বা দুজন ভলান্টিয়ার ঘড়ি দেখে সময়ের হিসেব রাখার দায়িত্ব নিতে পারে। ঘড়ি দেখে 'শুরু' বলার পর থেকে তুমি কতবার শ্বাস নিচ্ছো ও কতবার ছাড়ছো তা গুনতে থাকো। ভলান্টিয়ার যখন এক মিনিট পর 'শেষ' বলবে তখন নিচে লিখে রাখো।

স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের হার _____ বার প্রতি মিনিটে

✎ শিক্ষক কতবার দম নিয়েছেন জিজ্ঞেস করে দেখো। ক্লাসের বাকিদের সঙ্গেও তুলনা করে দেখো। (চাইলে ভলান্টিয়ারদের শ্বাসপ্রশ্বাসের হার দেখার জন্য আরেকটু সময় দিতে পারো, সেক্ষেত্রে তোমাদের আর কাউকে ঘড়ি দেখে সময়ের হিসাব রাখতে হবে) নিশ্চয়ই সবার দম নেয়ার সংখ্যা হুবহু সমান হয়নি?

✎ তোমরা সবাই জানো আমরা নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় বাতাসের অক্সিজেন নেই এবং নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড বের করে দেই। তবে বিষয়টি এতটাও সরল নয়, কারণ বাতাসে অক্সিজেন ছাড়াও আরও নানা উপাদান থাকে। তার মধ্যে রয়েছে অন্যান্য গ্যাস থেকে শুরু করে ধূলিকণা, এমনকি নানা জীবাণুও। বাতাস থেকে ধূলিকণা, জীবাণু ও অন্যান্য গ্যাস ফিল্টার করে অক্সিজেনকে আলাদা করতে শ্বসনতন্ত্রের অঙ্গগুলো কাজ করে। চলো জেনে নেই মানুষের শ্বসনতন্ত্রের অঙ্গগুলো কী কী?

✎ শ্বসনতন্ত্র কীভাবে গঠিত তা জানলে এর কাজ বুঝতে সহজ হবে। সেজন্য অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে 'মানুষের শ্বসনতন্ত্র' -এর চিত্রটা প্রথমে ভালো করে দেখো। এবার এসব অঙ্গ কোনটা কোথায় অবস্থিত, কাজ কী তা বই পড়ে এবং জোড়ায় আলোচনা করে বুঝে নাও।

✎ যেসব অঙ্গ বাইরে থেকে দৃশ্যমান অথবা অনুভব করা যায় সেগুলো নিজের শরীরে সাবধানে খেয়াল করো, প্রয়োজনে স্পর্শ করে অনুভব করো।

✎ এবার শ্বসনতন্ত্র কীভাবে কাজ করে তার একটা মডেল বানিয়ে দেখা যাক। শিক্ষকের পরামর্শে ৫/৬ জনের দলে ভাগ হয়ে যাও। শ্বসনতন্ত্রের মডেল কীভাবে বানানো যেতে পারে তা নিয়ে দলের সবাই আলোচনা করে দেখো।

এখানে শ্বসনতন্ত্র কীভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য একটা নমুনা মডেল দেয়া হয়েছে। তোমরা চাইলে অন্য কোনো উপায়েও মডেল বানিয়ে দেখতে পারো। এখানে দেয়া মডেলের জন্য তোমাদের দলের প্রয়োজন হবে তিনটি বেলুন, একটি প্লাস্টিকের পানির বোতল, পানীয় খাওয়ার পাইপ/স্ট্র, স্কচটেপ, কাঁচি। পরের সেশনে আসার আগে এই উপকরণগুলো জোগাড় করে এনো।

চতুর্থ ও পঞ্চম সেশন

পুরো শ্বসনতন্ত্রকে ভালোভাবে বুঝার জন্য শ্বসনতন্ত্রের মূল অঙ্গগুলো নিয়ে একটি মডেল বানানো যাক।

একটি কোমল পানীয়র নল বা ড্রিংকিং স্ট্রর এক প্রান্ত কাঁচি দিয়ে একটু চিরে নিয়ে এর ভেতর অপর দুটি স্ট্রর প্রান্ত এমনভাবে প্রবেশ করাও যাতে এটি দেখতে ইংরেজি Y বর্ণের মতো দেখায়।

স্ট্র তিনটির সংযোগস্থলে স্কচটেপ পেঁচিয়ে এমনভাবে জোড়া লাগিয়ে নাও যাতে সংযোগ স্থলের ছিদ্র দিয়ে কোনো বাতাস বের হতে না পারে।

এবার দুটি বেলুন Y আকৃতির ছড়ানো দু প্রান্তে লাগিয়ে নাও এবং স্কচটেপ পেঁচিয়ে আটকে দাও যাতে বাতাস বের হতে না পারে। একমুখ খোলা প্রান্তে বাতাস দিয়ে নিশ্চিত হয়ে নাও বেলুনটি ফুলছে কি না এবং সংযোগ দিয়ে কোনো বাতাস বের হচ্ছে কি না। পুরোপুরি বায়ুরোধী না হলে কিন্তু মডেলটি কাজ করবে না।

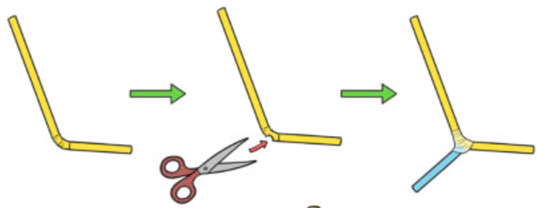

একটি প্লাস্টিকের পানির বোতলের তলার অংশ কেটে বাদ দিয়ে দাও।

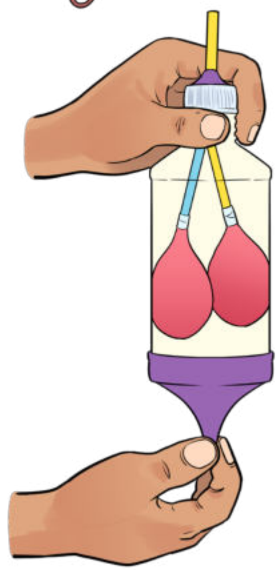

বোতলের মুখে একটা ছিদ্র করে নাও যাতে Y আকৃতির নলের খোলা প্রান্ত এর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করানো যায়। বেলুনসহ নলটিকে উল্টাদিকে ঘুরিয়ে বোতলের মুখের নিচ দিক দিয়ে প্রবেশ করাও যাতে বোতনের মুখের উপরে কিছুটা বাড়তি অংশ থাকে। এবার বোতলের মুখের ছিদ্রটি ভালো করে সিল করে (অল্প ময়দার সঙ্গে সামান্য পানি মিশিয়ে আঠার মতো তৈরি করে তা দিয়ে বোতলের মুখের ছিদ্রের চারপাশের অংশ বায়ুরোধী করে নিতে

পারো) মুখটা বোতলের সঙ্গে প্যাঁচ দিয়ে লাগিয়ে নাও। প্রয়োজনে এখানেও স্কচটেপ পেঁচিয়ে নিতে পারো যাতে বাতাস না বের হতে পারে।

- আরেকটি বেলুন নিয়ে এর মোটা মুখটি কেটে বাদ দাও এবং বেলুনটিকে ছবির মতো করে বোতলের তলায় লাগিয়ে দাও। বোতলের তলায় বেলুনটি যাতে আটকে থাকে সেজন্য স্কচটেপ পেঁচিয়ে খুব ভালোভাবে আটকে দাও।

- ব্যাস তোমাদের শ্বসনতন্ত্রের মডেল তৈরি।

- বোতলের তলায় লাগানো বেলুনটিকে পাশের ছবির মতো নিচের দিকে টেনে ধরো। দেখবে বোতলের ভেতরের বেলুন দুটি চুপসানো অবস্থা থেকে ফুলে উঠবে।

- এক্ষেত্রে কোন অংশ শ্বসনতন্ত্রের কোন অঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা যায়? অনুসন্ধানী পাঠের 'বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ অঞ্চল' অংশটুকু পড়ে মডেলের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজে বের করতে পারো কি না দেখো। দলে আলোচনা করে তোমাদের উত্তর নিচে লিখে রাখো।

মডেলের বিভিন্ন অংশ		শ্বসনতন্ত্রের তুলনীয় অংশ
1. বোতলের মুখ থেকে বের হওয়া Y আকৃতির মাঝের নল বা স্ট্র	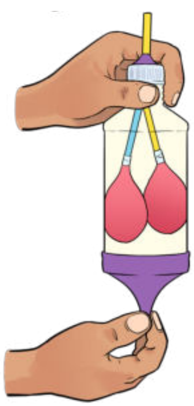	
2. বেলুনের সঙ্গে আটকানো দুপাশে ছড়ানো নল বা স্ট্র		
3. স্ট্রয়ের সঙ্গে আটকানো দুটি বেলুন		
4. বোতল		

- তোমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ তন্ত্রটি সুস্থ রাখতে নিয়মিত শরীরচর্চা, ব্যায়াম ও খেলাধুলা করা প্রয়োজন। তোমরা নিজেরাই ঘরে বসে করতে পারো এমন কিছু শ্বাসের ব্যায়ামের নির্দেশনা নিচে দেওয়া হলো। ক্লাসের সবাই মিলে এবার শিক্ষকের নির্দেশে এটি করা যাক।

- যে যার অবস্থানে স্বাভাবিকভাবে বসে নাক দিয়ে বুক ভরে দম নাও। কিছুক্ষণ ধরে রেখে ধীরে ধীরে

মুখ দিয়ে ছাড়ো। যতটা সময় ধরে নিঃশ্বাস নিয়েছ চেষ্টা করো ততটা সময় ধরে নিঃশ্বাস ছাড়তে। এভাবে এটা ৫-১০বার করো।

- এই চর্চাটি তুমি তোমার শ্বাস নেওয়ার সময় হাত উপরে তুলে এবং শ্বাস ত্যাগ করার সময় হাত নিচে নামিয়েও করতে পারো।

- এবার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে ডান দিকের নাসারন্ধ্র চেপে ধরে বাম নাসারন্ধ্র দিয়ে নিঃশ্বাস নাও। কিছুক্ষণ দম ধরে রেখে বাম নাসারন্ধ্রটিকে অনামিকা আঙুল দিয়ে চেপে ধরো এবং বৃদ্ধাঙ্গুল সরিয়ে ডান নাসারন্ধ্র দিয়ে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করো। এভাবে ৫-৭বার এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করো।

- তারপর একইভাবে বাম হাত ব্যবহার করে উল্টো কাজ করো।

- এই কয়েকবার শ্বাসের ব্যায়াম করার পর এখন বলো তো আগের চেয়ে বেশি ফুরফুরে ও চাঙ্গা লাগছে কি না?

ধাপ-৩

ষষ্ঠ সেশন

- একটা মেশিনে কোনো কিছু উৎপাদন করতে হলে যেমন কিছু কাঁচামাল লাগে তেমনি উৎপাদনের সময় অথবা উৎপাদন শেষে কিছু বর্জ্য অথবা উপজাত পদার্থও তৈরি হয়। এবার একটু ভেবে বলো তো, আমরা সারাদিন যে খাবার ও পানি খাই সেগুলো কোথায় যায়? এই খাদ্য ও পানীয় থেকে দেহ পুষ্টি গ্রহণ করার পর বর্জ্য হিসেবে কী উৎপন্ন হয়? এই বর্জ্য, বিশেষ করে তরল বর্জ্য হিসেবে কী উৎপন্ন হয়? শরীরের কোন অংশে এগুলো উৎপন্ন হয়?

- নিশ্চয়ই বলবে ঘাম আর মূত্র আকারে আমাদের শরীরের তরল বর্জ্য নিষ্কাশন হয়। ত্বকতন্ত্র কীভাবে ঘাম উৎপন্ন করে তা তো ইতোমধ্যেই জেনেছ। কিন্তু শরীরের কোন অংশে মূত্র তৈরি হয় তা কি বলতে পারবে? এই প্রক্রিয়ার নাম কী?

- অনেকেই হয়তো আগেই জানো যে রেচন প্রক্রিয়ায় মূত্র উৎপন্ন হয়, আর এই রেচনতন্ত্রের মূল অঙ্গ হলো কিডনি বা বৃক্ক। এখন এই রেচন প্রক্রিয়া কীভাবে ঘটে তা দেখা যাক।

- রেচন প্রক্রিয়াকে তোমরা ছাঁকনের সঙ্গে তুলনা করতে পারো। তবে এক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি ঘটে উলটোভাবে। আমরা যখন চা ছেঁকে খাই তখন তলানির চা পাতা ছাঁকনিতে জমা হয় যা আমরা পরে ফেলে দিই, আর ছাঁকনির মধ্য দিয়ে তরল চা বের হয়ে যায়। আর রেচন প্রক্রিয়ায় এই বর্জ্য আলাদা করার প্রক্রিয়াটি ঘটে উলটোভাবে। মানে রেচনতন্ত্র শরীরের জন্য পুষ্টিকর বা প্রয়োজনীয়

উপাদানগুলোকে শোষণ করে, আর তরল বর্জ্যকে শরীর থেকে বের করে দেয়।

- অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে বৃক্কের গঠন ও কীভাবে কাজ করে তা ভালো করে পড়ে নাও। যথারীতি পড়ার পর দলের সবাই আলোচনা করো।

সপ্তম সেশন

- এই সেশনে রেচনতন্ত্রের গঠন ও কাজ আরেকটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। আগের সেশনে তোমরা বৃক্কের গঠন ও কাজ কিছুটা জেনেছ। আজকে রেচনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গসমূহের বর্ণনা, বৃক্কের গঠন ও রক্ত পরিশোধনের ধাপসমূহ আবার ভালো করে পড়ে দলে আলোচনা করে নাও।

- পুরো প্রক্রিয়া ভালোভাবে বোঝার সুবিধার্থে খাতায় রেচনতন্ত্র ও বৃক্কের গঠন আলাদা আলাদা করে এঁকে নিতে পারো। কোথাও বুঝতে সমস্যা হলে শিক্ষকের সহায়তা নাও।

- এখন তোমাদের কাজ হলো অন্য দলের সদস্যদের পুরো বিষয়টি ব্যাখ্যা করা। লটারির মাধ্যমে তোমাদের দল থেকে একজনকে নির্বাচন করো যার কাজ হলো পরবর্তী দলের কাছে গিয়ে রেচনতন্ত্রের পুরো প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করবে। একইভাবে অন্য কোনো দল থেকেও লটারির মাধ্যমে একজন সদস্য এসে তোমাদের দলের বাকি সদস্যদের একই বিষয় ব্যাখ্যা করবে। এই ব্যাখ্যা করার সময় তোমাদের দলের কারো মনে প্রশ্ন থাকলে তার সঙ্গে আলোচনা করতে পারো, তাতে সবার ধারণা স্পষ্ট হয়ে যাবে। এই ব্যাখ্যা করার সময় দুটি বিষয় উল্লেখ করতে পারো। আলোচনার সুবিধার্থে আগেই নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর নিচে লিখে রাখো।

    - রেচনতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ কীভাবে একসঙ্গে কাজ করে? রেচন প্রক্রিয়ায় এদের কোনটির ভূমিকা কী?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

- শরীরকে সুস্থ ও স্থিতিশীল রাখতে, স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়া চলমান রাখতে রেচনতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ কীভাবে কাজ করে?

ধাপ-৪

অষ্টম ও নবম সেশন

- একটা সাইকেলের কথাই যদি তুমি ধরো, এর চাকাকে ঘোরানো হয় চেইন টেনে। চেইনটাকে টানার জন্য প্রয়োজন হয় প্যাডেলের যেখানে তুমি পা দিয়ে বল প্রয়োগ করো। তারপরেই না সাইকেলটি চলে। আবার থামানোর জন্য ব্রেক চাপতে হয়। আর তুমি কোন পথে যাবে তা নিয়ন্ত্রণ করো হ্যান্ডেল ধরে রেখে। অর্থাৎ এর প্রত্যেকটা অংশ আলাদা আলাদা কাজ করার মাধ্যমে তোমার সাইকেলটিকে সুশৃঙ্খলভাবে তুমি চালাতে পারো। ঠিক তেমনি, মানব শরীরের বিভিন্ন সিস্টেম বা তন্ত্র নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে আমাদের পুরো শরীর নামের সিস্টেমটিকে সচল রাখে।
- তোমাদের কি মনে আছে তন্ত্র কী? শ্রেণিতে আলোচনা করে আরেকবার ঝালিয়ে নাও।
- এবার জোড়ায় আলোচনা করে মানব শরীরের তন্ত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করে নাও। পরের পৃষ্ঠায় ছবিগুলো থেকে বিভিন্ন তন্ত্রের নাম ও এদের কাজ পাশের বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে নাও। ছক ১ -এ এক লাইনে এই তন্ত্রসমূহের কাজগুলো লিখে রাখো।

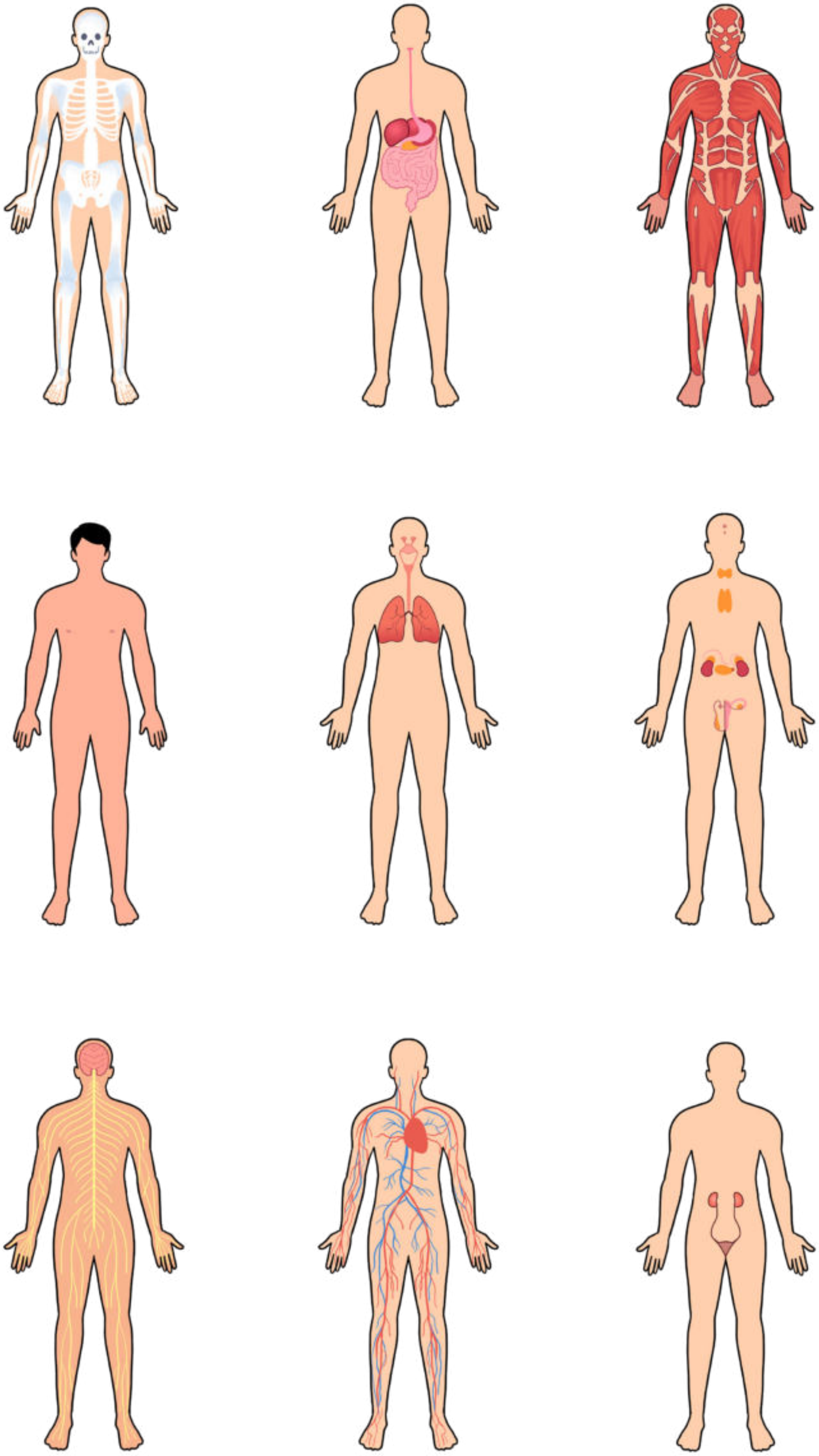

ছক ১

তন্ত্রের নাম	মূল কাজ (এক বাক্যে)
১.	
২.	

এবার একটু ভেবে দেখো, অসুখবিসুখ হলে তোমরা যখন ডাক্তারের কাছে যাও, ডাক্তার কী ধরনের টেস্ট বা পরীক্ষা করতে দেন? প্রায়ই তা হয় রক্ত পরীক্ষা, কিংবা ইউরিন বা মূত্র পরীক্ষা; তাই না? তোমাদের কখনও মনে প্রশ্ন এসেছে, শরীরের বিভিন্ন অংশে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা কীভাবে মূত্র বা রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায়? রেচনতন্ত্র কীভাবে কাজ করে তা তোমরা ইতোমধ্যে জেনেছ, রক্ত সংবহনতন্ত্র সম্পর্কেও উপরের শ্রেণিতে তোমরা জানবে। কিন্তু শরীরের অন্যান্য তন্ত্রের কাজের সঙ্গে কি এই তন্ত্রসমূহের কাজের সম্পর্ক আছে?

এই বিষয়ে একটু বিস্তারিত জেনে নিতে এই সেশনে তোমরা কোনো পেশাদার ডাক্তারকে তোমাদের ক্লাসে আমন্ত্রণ জানাতে পারো, সবচেয়ে ভালো হয় যদি তোমাদের কারো অভিভাবক থাকেন যিনি ডাক্তার। তার কাছে প্রশ্ন করে জেনে নাও :

- মূত্র পরীক্ষার মাধ্যমে কোন কোন সাধারণ রোগ শনাক্ত করা যায়?

....
....
....
....
....
....
....
....
....

- শরীরের কোন কোন তন্ত্রের কাজে ব্যাঘাত ঘটলে এসব রোগ দেখা দেয়?

....
....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

- এবার দলে বসে মানবদেহের একটা ছবি এঁকে নিয়ে বিভিন্ন তন্ত্র চিহ্নিত করে নাও। ডাক্তারের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যমতে কোন কোন তন্ত্রের কাজের সঙ্গে রেচনতন্ত্রের কাজের সম্পর্ক আছে তা ছবিতে দেখাও এবং ক্লাসের বাকিদের সামনে ব্যাখ্যা করো।

- বুঝতেই পারছ, শরীর সুস্থ রাখতে এর সবকটি তন্ত্রকে একটা বড়ো সিস্টেম আকারে কাজ করতে হয়, আর এই সবকটি তন্ত্র একে অন্যের কাজকে প্রভাবিত করে। কাজেই সুস্থ থাকার জন্য পুরো শরীরের যত্ন নেয়াই জরুরি।

- তোমরা এখন পর্যন্ত যেসব তন্ত্র সম্পর্কে জেনেছ, সেগুলো সুস্থ রাখতে কী কী সু-অভ্যাস করণীয়? দলে আলোচনা করে একটি তালিকা তৈরি করে ফেলতে পারো।

- এবার তোমাদের দলের তালিকাটি অন্যান্য দলকে দেখাও। তাদের তালিকায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে কি না তা দেখো। সবার তালিকা থেকে নেয়া সু-অভ্যাসের একটি তালিকা তোমাদের শ্রেণিকক্ষে ঝুলিয়ে রাখতে পারো, যাতে নিজের যত্ন নিতে কেউ ভুলে না যায়!

ফিরে দেখা

এই শিখন অভিজ্ঞতায় তুমি নতুন কী শিখলে যা তুমি তোমার পরিবারের সবাইকে জানাতে চাও?

....

মানবশরীরের কোন তন্ত্রটি তোমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়? কেন?

....

✎ এই অভিজ্ঞতার কাজ করার পর ব্যক্তিগত অভ্যাসে তুমি কী কী পরিবর্তন আনতে চাও?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

খাদ্যে ভেজাল!

ভেজাল খাদ্য একটি সামাজিক সমস্যা যা দৈনন্দিন জীবনে আমারা সবাই মুখোমুখি হয়েছি। এই সমস্যা গণস্বাস্থ্যের জন্য বেশ ক্ষতিকর। কতিপয় অসাধু মানুষ বেশি লাভের জন্য খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে ভেজাল দিচ্ছে। যার মাধ্যমে মানুষ নানা রকম জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এমনকি মৃত্যুর ঝুঁকি পর্যন্ত সৃষ্টি হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের উপস্থিতি সাধারণ মানুষের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাজারে অনেক ধরনের খাবারে আমরা ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি দেখা যায়, যা শাকসবজি, দুধ, ফলমূল এবং মাছ-মাংসসহ বিভিন্ন খাবারে থাকতে পারে। ভেজাল খাবার মানুষের বিভিন্ন ধরনের রোগের কারণ হতে পারে। এই জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়েই আমাদের এবারের অনুসন্ধান!

সেশন শুরুর আগে

- তোমরা আগেই জেনেছ, খাদ্যে ভেজাল এখন একটি জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পত্রপত্রিকা, টিভি নিউজ তো বটেই তোমরা নিজেরাও হয়তো কখনো না কখনো ভেজাল খাদ্যের প্রতারণায় পড়েছ।

- সেশনের শুরুতেই তোমাদের কাজ হবে পত্রিকা, টেলিভিশনের খবর, ইন্টারনেট, বাড়ির বড়োদের কাছ থেকে কিংবা এলাকার খাদ্য ব্যবসায়ী, মুদির দোকানদারের কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট খাদ্যে ভেজাল সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে টিক চিহ্নের মাধ্যমে নিচের ছকটি পূরণ করা। একাধিক খাদ্য সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করতে চাইলে নিচের ছকটির মতো করে একটি ছক তোমার খাতায় তুলে নিয়েও কাজটি করতে পারো। এমনকি চাইলে তুমি নতুন কোনো প্রশ্নও যোগ করে নিতে পারো।

ছক-১

আপনি কি খাদ্যে ভেজাল সম্পর্কে জানেন?	হ্যাঁ	না				
খাবারের ধরন	শাকসবজি	মাছ-মাংস	দুধ	প্রক্রিয়াজাত	অন্যান্য	
কী ধরনের খাদ্য দূষণ?	রাসায়নিক	জীবাণু	মাইক্রো প্লাস্টিক	টেক্সটাইল রং	অপদ্রব্য	অন্যান্য
কোথায় খাদ্যে ভেজাল ঘটে?	বাড়ি	রেস্টুরেন্ট	বাজার	কারখানা	অন্যান্য	
ভেজালের কারণ?	টেক্সটাইল রং	কীটনাশক	অ্যান্টিবায়োটিক	দূষিত পানি	ফরমালিন	অন্যান্য

স্বাস্থ্যের উপর ভেজালযুক্ত খাবার খাওয়ার প্রভাব	ক্যান্সার	চর্মরোগ	ফুসফুসের সমস্যা	দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য ঝুঁকি	খাদ্যে বিষক্রিয়া	অন্যান্য
ভেজাল খাদ্য গ্রহণ করে আপনি বা আপনার পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়েছেন?	হ্যাঁ	না				
খাদ্যে ভেজাল নিরসনে করণীয় কী হতে পারে?	খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ	সরকারি বিধিবিধান ও আইন	গণসচেতনতা	সঠিকভাবে খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ	অন্যান্য	

কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে ‘অন্যান্য’ ঘরটি তোমরা নিজেরা লিখে নিতে পারো। একাধিক উত্তরের ক্ষেত্রে একাধিক টিক চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে।

প্রথম সেশন

- ক্লাসে তোমার পাশের সহপাঠীর সঙ্গে তোমার সংগ্রহ করা তথ্যগুলো শেয়ার করে নাও।
- এবার ক্লাসের সবার সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের পালা। একেকজন একেক ধরনের খাদ্যে ভেজাল নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছ, একেকটা উৎস থেকে তথ্য নিয়েছ। তাহলে সামগ্রিক চিত্রটা কি দাঁড়ালো তা বুঝতে ছোটো একটা পরিসংখ্যান করে ফেলতে পারো। এজন্য তোমাদের ক্লাসের সবার তথ্যগুলোকে একটি নির্দিষ্ট তথ্যসারণিতে লিখে ফেলতে হবে। তার আগে জেনে নাও মোট তথ্যদাতা কতজন।
- নিচের তথ্য সারণি ব্যবহার করতে পারো ,চাইলে খাতায় এরকম একটি ছক বানিয়েও করতে পারো।

ছক-২

প্রশ্ন	পরিসংখ্যান
মোট তথ্যদাতা	_______জন

	বিকল্প উত্তর	টালি	গণসংখ্যা	শতকরা
আপনি কি খাদ্যে ভেজাল সম্পর্কে জানেন?	হ্যাঁ			
	না			
খাবারের ধরন	শাকসবজি			
	মাছ-মাংস			
	দুধ			
	প্রক্রিয়াজাত			
কী ধরনের খাদ্য দূষণ?	রাসায়নিক			
	জীবাণু			
	মাইক্রো প্লাস্টিক			
	টেক্সটাইল রং			
	অপদ্রব্য			
কোথায় খাদ্যে ভেজাল ঘটে?	বাড়ি			
	রেস্টুরেন্ট			
	বাজার			
	কারখানা			
ভেজালের কারণ?	টেক্সটাইল রং			
	কীটনাশক			
	অ্যান্টিবায়োটিক			
	দূষিত পানি			
	ফরমালিন			

স্বাস্থ্যের উপর ভেজালযুক্ত খাবার খাওয়ার প্রভাব	ক্যান্সার			
	চর্মরোগ			
	ফুসফুসে সমস্যা			
	দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য ঝুঁকি			
	খাদ্যে বিষক্রিয়া			
ভেজাল খাদ্য গ্রহণ করে আপনি বা আপনার পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়েছেন?	হ্যাঁ			
	না			
খাদ্যে ভেজাল নিরসনে করণীয় কী হতে পারে?	খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ			
	সরকারি বিধিবিধান ও আইন			
	গণসচেতনতা			
	সঠিকভাবে খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ			

ক্লাসে সবার পাওয়া তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তোমরা খাদ্যে ভেজাল সংক্রান্ত একটা সার্বিক পরিসংখ্যান পেলে।

এবার ৪/৫ জনের একটা দলে ভাগ হয়ে গিয়ে এই পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা করে নাও।

বাড়ির কাজ

এবার তুমি যে খাবারটা খাও সেটা হয়তো সরাসরি তোমার কাছে আসে না। এর জন্য তোমাকে অনেকের উপর যেমন নির্ভর করতে হয় তেমনি অন্য কোনো জীবের উপরও নির্ভর করতে হয়। চলো এবার যে কোনো একটি খাবার নির্বাচন করে (তুমি যে খাবারের তথ্য সংগ্রহ

করেছ), তার উৎস সন্ধান করা যাক:

নিচের ডায়াগ্রামটি লক্ষ করো, এখানে মিষ্টি/রসগোল্লা তৈরিতে যা যা লাগে তা কোথা থেকে ও কীভাবে তোমার কাছে এসেছে তা দেখানো হয়েছে।

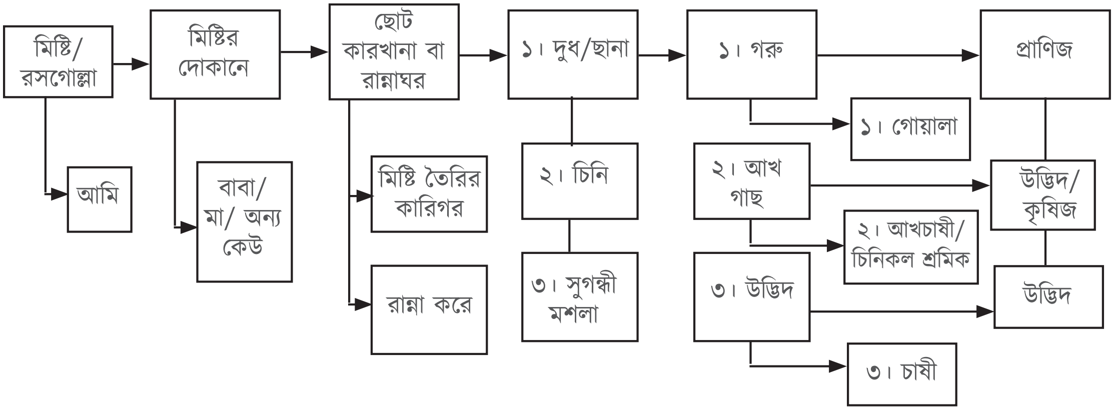

তুমি কি এবার তোমার সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তোমার নির্বাচিত খাবারটা কীভাবে তৈরি হলো, উপাদানগুলো কোথা থেকে পাওয়া গেল তা দেখাতে পারবে? নিচের ডায়াগ্রামের ফাঁকা জায়গায় লিখে রাখো।

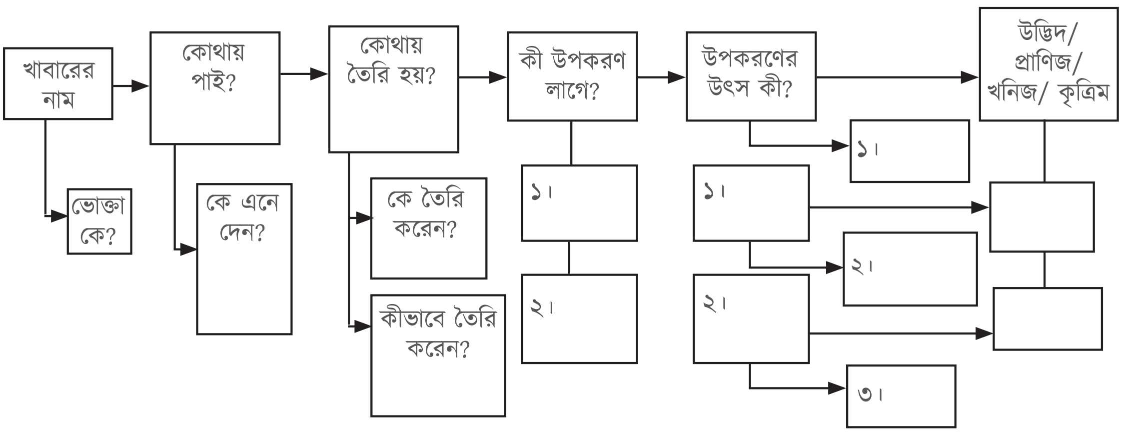

এবার লাল কালির কলম অথবা রংপেন্সিল দিয়ে পূরণ করে ঘর/ঘরগুলো চিহ্নিত করো, কোন পর্যায়ে খাদ্যে ভেজাল মেশানো হচ্ছে কিংবা কে বা কারা খাদ্যে ভেজাল দিচ্ছে।

দ্বিতীয় সেশন

- বিগত সেশনের কাজ ও বাড়ির কাজ থেকে একটা জিনিস কি লক্ষ করেছ? খাদ্যে ভেজালের একটা অন্যতম নিয়ামক হলো রাসায়নিক পদার্থ। তাহলে কি তুমি ভাবছ রসায়নের ব্যবহার আমাদের জীবনে নেতিবাচক? তা কিন্তু মোটেও নয়। বিজ্ঞানের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কিছু অসৎ মানুষ অপবিজ্ঞানকে আবিষ্কার করেছেন। আমাদের জীবনে রসায়নের ভূমিকা অসামান্য। চলো এই সেশনে সেই সম্পর্কে কিছু জেনে নেওয়া যাক।

- অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে 'দৈনন্দিন জীবনে রসায়নের ব্যবহার' অধ্যায়টা বের করে গৃহস্থালির রসায়ন অংশটা ভালো করে পড়ে নাও। পড়া শেষে পাশের সহপাঠীর সঙ্গে শেয়ার করো। প্রয়োজনে শিক্ষকের সহায়তা নাও।

- খাওয়ার লবণ, বেকিং পাউডার, ভিনেগারের ব্যবহার তো তোমরা জানলে। খাদ্য সংরক্ষণে লবণ ও ভিনেগার ব্যবহারের একটা পরীক্ষণ করা যাক।

- চারটি কাচের অথবা প্লাস্টিকের বোতল নিয়ে তাতে ১ বা ২টি করে কাঁচামরিচ অথবা ছোটো কোনো সবজি/ফল রেখে ১ম বোতলে পানি, ২য় বোতলে লবণ মিশ্রিত পানি, ৩য় বোতলে ভিনেগার দিয়ে পূর্ণ করো। ৪র্থ বোতলটি খালি রেখে সংরক্ষণ করে রাখো কিছুদিনের জন্য।

- তোমাদের কাজ হবে আগামী এক সপ্তাহ বোতলের ভেতরের সবজি বা ফল পর্যবেক্ষণ করা।

- এছাড়াও আরও অনেক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়। ফল অথবা সবজির টুকরা দীর্ঘ সময় চিনির সিরায় ডুবিয়ে পরে সিরা নিংড়িয়ে মোরব্বা তৈরি করা হয়। মোরব্বা তৈরি করার সময় ফলের জলীয় অংশ অনেকটা কমিয়ে চিনির পরিমাণ বাড়িয়ে প্রায় শুকনো অবস্থায় এনে সংরক্ষণ করা যায়। মোরব্বাতে ফল বা সবজির আকৃতি বজায় থাকে। আম, বেল, চালকুমড়া, আনারস, ইত্যাদি ফল ও সবজি থেকে মোরব্বা তৈরি করা হয়।

- গৃহস্থালিতে আর কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ কী কাজে ব্যবহৃত হয় তার একটি তালিকা তৈরি করে ফেলো। অনুসন্ধানী পাঠের সাহায্য তো নেবেই, পাশের সহপাঠীর সঙ্গেও আলোচনা করে নিতে পারো।

ছক-৩

গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থের নাম	যে কাজে ব্যবহৃত হয়

তৃতীয় সেশন

- গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত অন্যতম একটি রাসায়নিক পদার্থ হলো সাবান। তোমরা আমাদের ল্যাবরেটরি অভিজ্ঞতায় নিজেরা সাবান প্রস্তুত করেছ। চলো তাহলে এবার জেনে নেওয়া যাক সাবান কীভাবে ময়লা পরিষ্কার করে?

- অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে সাবান ও ডিটারজেন্টের পরিষ্কার করার কৌশল অংশটুকু পড়ে জেনে নাও সাবান কীভাবে ময়লা দূর করে। এছাড়াও পরিষ্কারক সামগ্রী হিসেবে আর কী কী রাসায়নিক ব্যবহৃত হয় তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার রসায়ন অংশ পড়ে জেনে নাও।

- তোমার নিজের পড়া শেষ হলে পাশের সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো। প্রয়োজনে শিক্ষকের সহায়তা নাও।

- সাবান ও ডিটারজেন্টের পরিষ্কার করার কৌশল অংশটুকু পড়ার আলোকে নিচের ছকটি পূরণ করো। এই অভিজ্ঞতায় ইতঃপূর্বে তোমরা যে দল গঠন করেছ, সেই একই দলে আলোচনা করে ছকটি পূরণ করো।

প্রশ্ন	শিক্ষার্থীদের উত্তর
সাবানের রাসায়নিক নাম কী?	
তোমাদের মতামত অনুসারে সাবানের দুটি অংশের নাম কী কী?	

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

প্রশ্ন	শিক্ষার্থীদের উত্তর
সাবানের দুটি অংশের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য কী কী?	১। ২।

প্রশ্ন	শিক্ষার্থীদের উত্তর
কাপড় থেকে ময়লা দূর করার সময় সাবানের দুটি অংশ কীভাবে থাকে? চিত্র অঙ্কন করে দেখাও।	
সাবানের কোন অংশ কাপড় থেকে ময়লা দূর করতে অধিকতর ভূমিকা রাখে? কেন?	

চতুর্থ সেশন

- গৃহস্থালি ছাড়াও কৃষি, শিল্প, বস্ত্র খাতসহ এমন কোনো ক্ষেত্র নাই যেখানে রসায়নের ব্যবহার হয় না। চলো জেনে নেওয়া যাক আর কোন কোন ক্ষেত্রে রসায়নের ব্যবহার কীভাবে হচ্ছে।

- অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে রসায়ন, অংশটুকু ভালো করে পড়ে নাও। তোমার

নিজের পড়া শেষ হলে পাশের সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো। প্রয়োজনে শিক্ষকের সহায়তা নাও।

- এবার একটা জিনিস খুব গভীরভাবে ভেবে দেখো তো, এই যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রসায়নের ব্যবহার করতে গিয়ে কি কোথাও কোথাও শিল্পবর্জ্য বের হচ্ছে না? ফলে কি পরিবেশ দূষণ হচ্ছে না?

- তাহলে অনুসন্ধানী পাঠ থেকে 'শিল্পবর্জ্য ও পরিবেশ দূষণ' অংশটুকু পরে পাশের সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করে নাও কীভাবে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এই বিষয়ে। প্রয়োজনে শিক্ষকের সহায়তা নাও।

- তুমি নিশ্চয়ই জেনেছ, মাইক্রো প্লাস্টিকের দূষণের ফলে আমাদের শরীরের ডিএনএ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। দূষিত প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে আমাদের শরীরে কীভাবে মাইক্রো প্লাস্টিক আসতে পারে তুমি কি ভেবে লিখতে পারবে? চাইলে ছবি এঁকেও দেখাতে পারো নিচের খালি জায়গাতে।

- খাদ্যে ভেজাল থেকে শুরু করে পরিবেশ দূষণ এইসব কিছু রোধে প্রয়োজন গণসচেতনতা। রসায়ন আমাদের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কিন্তু এর অপব্যবহার আমাদের জীবনে ঝুঁকি বয়ে আনছে। তোমরা নিজেরা সচেতন হয়ে যদি আশপাশের পাড়া-প্রতিবেশীদের সচেতন করো তাহলে সবচেয়ে বড়ো কাজ হবে।

- তোমরা পরের সেশনে এই কাজটি করবে। তবে আজ এই সেশনে পরিকল্পনাটা করে নিতে পারো। ক্লাসের সবাই ৬-৮ জনের এক একটি দলে ভাগ হয়ে যাও।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

- খাদ্যে ভেজাল নিয়ে তোমরা যে জরিপটি করেছ সেটা এখন খুব কাজে আসবে। জরিপের পরিসংখ্যানগুলো ব্যবহার করে তোমরা প্রতিবেদন লিখতে পারো, পোস্টার তৈরি করতে পারো, বিভিন্ন রকমের লেখচিত্র বা গ্রাফ তৈরি করতে পারো। কোন দল কী কাজ করবে তা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে ঠিক করে নাও।

- কাজগুলো করতে কী কী উপকরণ লাগবে, কীভাবে উপস্থাপন অথবা প্রদর্শন হবে তাও ঠিক করে নাও।

পঞ্চম সেশন

- এবার কাজে নামার পালা। আগে থেকে তোমরা যেহেতু পরিকল্পনা করে রেখেছ, তাই আর সময় নষ্ট না করে কাজে হাত লাগাও। কাজটা সম্পূর্ণ তোমাদের নিজেদের হাতে করবে। প্রতিবেদন, পোস্টার, ব্যানার, কমিক্স ইত্যাদি যে কোনোভাবে তোমরা গণসচেতনতার কাজটি করতে পারো। সচেতনতার প্রসঙ্গে তোমাদের কাজে-

  ☑ খাদ্য কেনার সময় সচেতনতা
  ☑ খাদ্য সংরক্ষণের সময় সচেতনতা
  ☑ খাদ্য প্রস্তুতের সময় সচেতনতা
  ☑ খাদ্য খাওয়ার সময় সচেতনতা

- এবং শিল্পবর্জ্য, পরিবেশ দূষণ, ও কীটনাশক প্রসঙ্গে-

  ☑ ইকো সিস্টেমে এসবের নেতিবাচক প্রভাব ও সমাধান

- এসব বিষয়বস্তু যেন থাকে তা খেয়াল রেখো। চাইলে আরও কোনো পয়েন্ট তোমরা যোগ করতে পারো।

- কাজ শেষে, সবাই মিলে আলোচনা করে নাও কীভাবে সব দলের কাজগুলো প্রদর্শিত হবে। চাইলে যেখানে গণসমাগম বেশি এমন কোথাও সাঁটিয়ে দিতে পারো।

ফিরে দেখা

তোমার এলাকায় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বা ভেজালের সম্ভাবনা বেশি এমন খাবার কোনটি? এসব খাবারে কী ধরণের দূষণ ঘটে?

ভেজাল খাবারের ঝুঁকি থেকে বাঁচতে তোমার পরিবারে কী ধরণের সচেতনতা তৈরি করতে চাও?

নিরাপদ খাবারের জন্য সচেতনতা তৈরিতে তোমার কমিউনিটিতে তোমার কী করার আছে?

ডিজিটাল তথ্য সেবা: টেলিমেডিসিন ও কৃষি কল সেন্টার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এ রূপান্তরিত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন ২০০৮ সালে। ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রায় সকল সেবাই জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে সরকার।

ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা- টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে বিনামূল্যে ও সহজে স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের ১৮টি হাসপাতালে বর্তমানে উন্নতমানের টেলিমেডিসিন সেবা চালু আছে। টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে রোগীগণ বিশেষায়িত হাসপাতালের চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে পারছেন। মোবাইলের মাধ্যমেও রোগীগণ বিশেষায়িত চিকিৎসকের সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। করোনা মহামারির সময়ে এই সেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ডিজিটাল কৃষি সেবা- কৃষি সম্পর্কিত সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, সেবা ও তথ্য সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কৃষি কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। কৃষি কল সেন্টারটি খামারবাড়ি, ঢাকাতে কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরে স্থাপিত। কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে ফোন করে কৃষি বিষয়ক যে কোনো সমস্যার তাৎক্ষণিক বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিতে পারেন দেশের জনগণ।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল অষ্টম শ্রেণি বিজ্ঞান | অনুশীলন বই

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করো

— মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মিতব্যয়ী হওয়া ভালো

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য